নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার ❑ সালাহউদ্দীন আইয়ুব

নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

নজরুল ইন্সটিটিউট

নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার
সালাহউদ্দীন আইয়ুব

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪০৪ / জুন ১৯৯৭

প্রকাশক
রশিদুন নবী
ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
নজরুল ইন্সটিটিউট
কবিভবন
বাড়ি নং ৩৩০-বি, রোড নং ২৮ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
হাশেম খান

মুদ্রক
মেমোরিয়াল অফসেট প্রিন্টার্স
৬৮, যোগীনগর রোড, ওয়ারী
ঢাকা-১২০৩

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

NAZRUL-SAHITTYER NANDANTATTIK BICAR by Salahuddin Ayoub, published by Rashidun Nabi, Assistant Director in-charge, Research & Publication Department, Nazrul Institute, Kabi Bhaban, House No. 330-B, Road No. 28 (Old), Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209, Bangladesh.

Price
Taka 70.00 only / US $ 5
ISBN — 984 — 555 — 161 — 0

উৎসর্গ

ড. মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আহমেদ
ও
ড. ফরিদা আখতার আহমেদ
যাঁদের দরদী মন ও প্রকাণ্ড হৃদয়ের আনুকূল্যে
আমার ও ফৌজিয়ার বহু বহু দিন ও রাত্রির, বর্ষা ও বসন্ত কেটেছে

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মনীষার এক মহত্তম বিকাশ, বাঙালির সৃষ্টিশীলতার এক তুঙ্গীয় নির্দশন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। নজরুল তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে যুক্ত করেছেন যুগ-মাত্রা।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, সাহিত্য-সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ নজরুল ইন্সটিটিউটের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এ উদ্দেশ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট 'নজরুল ইন্সটিটিউট উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (সংশোধিত) প্রকল্প'-এর আর্থিক সহযোগিতায় নজরুলের সামগ্রিক অবদানের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা-কার্য পরিচালনা ও তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রফেসর আনিসুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে সালাহউদ্দীন আইয়ুব 'নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার' বিষয়ে গবেষণা-কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছেন এবং তা বিশেষজ্ঞ-কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

যাঁরা গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক থেকে নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি দূর করা সম্ভব হলো না। এ-জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

জুন, ১৯৯৭

মুহম্মদ নূরুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক

ভূমিকা

আমার বর্তমান গবেষণার নির্দেশক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পাঠ করা যায় কিনা, তার সম্ভবপরতা এ-গ্রন্থে পরীক্ষা করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। আমার আলোচনায় উদ্ধৃতির প্রাচুর্য না দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই, কেননা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি নজরুলের লেখা পাঠ করার চেষ্টা করেছি। নজরুলের সাহিত্য বিভিন্ন দিক থেকে পাঠ করা যেতে পারে। আবদুল মান্নান সৈয়দ-সহ আরো অনেক গবেষক নজরুলের রচনা বিভিন্নভাবে পাঠ করেছেন এবং বিচার করেছেন।

আমি নজরুলের লেখা পাঠ করেছি, বিচার করিনি। সমকালীন সাহিত্যতত্ত্বে প্রতিশ্রুত হবার কারণে বিচার ও রায়ঘোষণায় আমার আস্থা কম। উল্লেখ্য, বিদেশে 'ক্রিটিসিজমে'র বদলে এখন 'রিডিং' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

দাপ্তরিক তাগিদ নয়, সহধর্মিণী অধ্যাপিকা ফৌজিয়া আখতারের অবিস্মরণীয় অনুপ্রেরণায় এ বই রচিত হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টরেট করতে যাবার আগেভাগেই যে লেখাটা শেষ করে প্রেসেও ধরানো গেল, তার কৃতিত্ব একান্তভাবেই পরিচালক হুদা ভাইয়ের।

নজরুল ইন্সটিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা রশিদুন্ নবী-র সপ্রাণ সহযোগও কখনোই ভুলবার নয়।

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

জুন ১০, ১৯৯৭
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ এক

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও নজরুল ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক প্রজ্ঞা আমাদের বিচলিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসঙ্গ আসছে একারণে যে, ঔপনিবেশিক বাংলায় লেখাপড়ার সঙ্গে জগতের প্রায় সকল জিনিশের মূল্যপ্রতিষ্ঠার যোগ ছিল নিবিড়। সেজন্যে সেসময় আরো অনেককিছুর মতো, ভাল সাহিত্যের সম্ভবপরতা ইংরেজি শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় নি। উচ্চ শিক্ষা ছাড়া ব্রিটিশ কলোনিতে চাকরি মেলা দুঃসাধ্য, অতএব উচ্চসাহিত্য সৃষ্টিও কল্পনার অতীত। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ-জড়িত করে কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা শ্রেষ্ঠশিল্পের অভূতপূর্ব অথচ উপনিবেশ-সম্মত, ক্যাটেগরি রচনা করে ফেলেছিলেন, তা আজ দুরূহ খোঁজাখুঁজির বিষয়।

নজরুল সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে অবতীর্ণ হয়ে আমরা তিনটি মোটা দাগের প্রশ্নের মুখোমুখি হই ঃ (ক) নজরুল ইসলামের নিজস্ব নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা কি? (খ) সেসব ধ্যানধারণা কি কেবলি তাঁর কবিতা-কথকতা-সঙ্গীতে অভিব্যক্ত, নাকি তাঁরই লেখা বর্ণনামূলক গদ্যেও এর বিবরণ আছে? (গ) নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সম্ভবপর পুনর্গঠনের পর তাঁর সাহিত্যের বিচার কি কিংবা কেমন হতে পারে?

ইংরেজিতে যাকে aesthetics বলে জানি, বাংলায় তাকেই নন্দনতত্ত্ব বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, সৌন্দর্যবিজ্ঞান। রেমণ্ড উইলিয়ামসের[১] মতে, aesthetic শব্দটি ইংরেজি ভাষায় উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রথম দেখা দেয়, তার আগে এর প্রচলন ছিল না। যদিও এ শব্দের গ্রিক রূপ আছে, তবুও aesthetic জর্মন ভাষা থেকে ধার করা। জর্মন ভাষায় এর সমালোচনামনস্ক ও বিতর্কিত উন্নয়ন-বিকাশের পর ইংরেজিতে এর চল হয়। ল্যাটিনে আলেকজাণ্ডার বাউমগার্টেন (১৭১৪-৬২) Aesthetica নামে দু'খণ্ডে একখানা বই লেখেন। বাউমগার্টেন সৌন্দর্যকে চিহ্নিত করেন প্রপঞ্চগত শুদ্ধতা হিসেবে। তিনি বললেন, সৌন্দর্য বোঝা যায় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। sense perception অর্থে গ্রিক ভাষায় aisthesis ব্যবহৃত হত। গ্রিক ভাষায় এই শব্দের আবির্ভাব ঘটে মূলত বস্তুগত

বিষয় ও অবস্তুগত বিষয়ের মধ্যে তফাত নির্দেশের জন্যে। অর্থাৎ কিছু জিনিশ আছে যা ইন্দ্রিয়গোচর এবং ইন্দ্রিয়সহযোগে উপলব্ধ, আর কিছু জিনিশ আছে যা ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যায় না, কেবল চিন্তা করা যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য ও চিন্তাযোগ্য-দু'ধরনের জিনিশ আছে। বাউমগার্টেন মন্ময় ইন্দ্রিয় সক্রিয়তার উপর জোর দিয়ে মানবিক শিল্পের সৃষ্টিশীলতার কথা বোঝাতে চাইছিলেন।

ইমানুয়েল কান্টও 'সৌন্দর্য'কে-বিশেষভাবে এবং অবধারিতভাবে-ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ প্রপঞ্চ ভেবেছেন। কান্টের সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা মৌলিক গ্রিক ধারণার অধিকতর নিকটবর্তী। কান্ট aesthetic বলতে বোঝেন, the science of the conditions of sensuous perception.

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি উদাহরণে 'সুন্দর' কথাটি শিল্পকলার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত। ১৮৭৯ সালে লিউস abstract science of feeling কে অভিন্নার্থে প্রয়োগ করেন।

aesthetics শব্দটি অনেকেরই পছন্দ ছিল না। ১৮২১ সালে কোলরিজ বলছেন, রসোপলব্ধি ও সমালোচনাকর্মের জন্যে এর (aestheitics) চেয়ে বেশি পরিচিত ও আদৃত শব্দ পেলে তাঁর ভাল লাগত। ১৮৪২ সালে কেউ কেউ একে a silly pedantical term হিশেবে চিহ্নিত করেন। ১৮৫৯ সালে স্যার উইলিয়াম হ্যামিলটন aesthetics-কে রসাস্বাদের দর্শন, ললিতকলার তত্ত্ব এবং সুন্দরের বিজ্ঞান হিশেবে বুঝবার ভাববার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, এটি শুধু জর্মানিতে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সমান পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত একটা ধারণা। তবে এ শব্দের বদলে তিনি apotaustic শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। বলাবাহুল্য, aesthetics ছাড়া আর কোনো শব্দই চলেনি।

ওয়াল্টার পেটারকে ঘিরে পাশ্চাত্যজগতে 'নান্দনিক আন্দোলন' দানা বেঁধে উঠলে aesthetic শব্দের একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা তৈরি হয়। শব্দটিকে ঘিরে একটা বিশেষ ধরনের বিশ্বাস, ধারণা ও ইমেজ গড়ে ওঠে। এমনকি এক ধরনের বিতর্কও। ম্যাথু আর্নল্ডের 'কালচার' শব্দটিকে কেন্দ্র করেও তা হয়েছিল।

রেমণ্ড উইলিয়ামস[২] বলেন, aesthetic শব্দটি শিল্পের, কখনো দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিমার, কখনো অসাধারণ, এবং সুন্দরের বিশেষ রেফারেন্স হিশেবে ইতিহাসের বিভিন্ন মুহূর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। এরই সঙ্গে শব্দটি গুরুত্ব দিয়েছে মন্ময়তাকে, এবং মন্ময় অনুভূতি-সক্রিয়তাকে শিল্প ও সৌন্দর্যের ভিত্তি হিশেবে গণ্য করে এ দুটোকে তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আধুনিক চৈতন্যে শিল্প আর সমাজের মধ্যে যে বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য তৈরি হয়, তার মূলেও aesthetic শব্দের বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশের কার্যকারণ জড়িত।

ব্যক্তির মন্ময় চেতনা ও মন্ময় সৃষ্টিশীলতাকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেয় নান্দনিকতাবাদ। শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যে সৌন্দর্যের প্রতি নিবেদিতচিত্তকে বলা হয় aesthetic। যাকে নান্দনিকতাবাদ বলছি, তা উনবিংশ শতাব্দীতে 'আন্দোলনে'র রূপ পরিগ্রহ করে।[৩] এ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল, শিল্প স্বনির্ভর, এবং নিজের উদ্দেশ্য ছাড়া শিল্পের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। নিজের বাইরে শিল্পের আর কোনো সত্য নেই, লক্ষ্য নেই, গন্তব্য নেই; শিল্পের কোনো অঙ্গীকার থাকেনা, কোনো প্রোপাগাণ্ডার কাছে শিল্প প্রতিশ্রুত নয়, এবং শিল্প কখনোই নীতিমূলক নয়। এ জন্যে কোনো অনান্দনিক মানদণ্ডে শিল্পের বিচার করা যাবে না। নন্দনতত্ত্বের এসব উনিশতকীয় প্রতিজ্ঞার উৎসমুখ খুঁজতে গেলে কতিপয় বিখ্যাত জর্মন ভাবুকের নামোল্লেখ জরুরি হয়ে পড়ে, যেমন কান্ট, শেলিং, গ্যেটে ও শিলার। এরা সকলে শিল্পের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন[৪]।

শিল্প ও সৌন্দর্যের নান্দনিকতা বিষয়ক উপরোক্ত বিশ্বাস ও অনুজ্ঞা থেকে — ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্বে — এই ধারণার জন্ম হয় যে, শিল্পী আর দশজনের মত মানুষ নন, শিল্পী অনন্য। শিল্পী একটি বিশেষ সত্তা, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অসাধারণ। টেনিসন দম্ভভরে ঘোষণা করেছিলেন, সাধারণ নশ্বর মানুষের চেয়ে শিল্পী সব দিক থেকে আলাদা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বোহেমিয়ান নন-কনফরমিস্ট হিশেবে শিল্পীর একটা বিশেষরকম 'ইমেজ' উদ্ভূত ও বিকশিত হয়, যার অন্তঃসাক্ষ্য টেনিসনের উচ্চারণে মেলে। রোমান্টিক মন্ময়তাবাদ ও রোমান্টিক আত্মসংস্কৃতির, এবং ব্যক্তিক অহম ও সংবেদনশীলতার এ হল একটা দীর্ঘকালব্যাপী পরিণতি।

নান্দনিকতাবাদে জর্মন ভাবুকতার যে প্রভাবের কথা বলেছি, তার মধ্যে সর্বাগ্রে গ্যেটের কথা উল্লেখ্য। গ্যেটের চিন্তা কার্লাইল ও কোলরিজের হাত ধরে ইংল্যান্ডে, এবং এডগার এলান পো ও রালপ্ ওয়ালডো এমর্সনের মধ্যস্থতায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তার পায়। অন্য দেশগুলোর মত, ফরাশি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে এর প্রভাব। সেসময় তারই পাশাপাশি একটা মতবাদ উদ্ভূত হয়, যাকে আমরা বলি, 'শিল্পের জন্য শিল্প'। এরপর এলান পো ও বোদলেয়ার নান্দনিকতাবাদকে একটা কাল্ট হিশেবে দাঁড় করান (যার উত্তরসাধনা দেখি ফ্লোবেয়ার ও মালার্মের মধ্যে)। ফরাশি প্রতীকবাদী কবিদের ওপর উভয়ের মিলিত প্রভাব ছিল বিরাট। ইংল্যান্ডে নান্দনিকতাবাদের যে উত্থান ঘটে, তা মূলত ফরাশি প্রভাব ও দেশজ চিন্তাধারার ফল। নান্দনিকতাবাদের মূল প্রত্যয় ছিল, শিল্পকলা হবে রেফারেন্সহীন'; শিল্প-উপভোগ বা বিবেচনার ক্ষেত্রে জীবন, নৈতিকতা, ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ অবান্তর। ভিক্টোরিয় পর্বের শেষদিককার একজন ইংরেজ কবি সুইনবার্ণ 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদে দীক্ষিত প্রতিশ্রুত ছিলেন। বোদলেয়ার সুইনবার্ণকে প্রভাবিত করেছিলেন।

সেসময় ওয়াল্টার পেটার তো এমনও বলে বসেছিলেন যে, শিল্পের প্রেরণা দিয়ে জীবনকে গণ্য করা উচিত। মনে পড়বে ওয়াল্টার পেটারের The Renaissance (1873) প্রবন্ধ সংকলনটির কথা, যার প্রভাব উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের কবিরা প্রেরণার সঙ্গে অন্তর্গত করে নেন। জীবন নয়, শিল্প; অথবা জীবনের বদলে শিল্প; অথবা জীবনের বিকল্প হিশেবে শিল্প—ওয়াল্টার পেটার এভাবে ভাবতে উৎসাহী ছিলেন। জীবনকে শিল্প হিশেবে দেখতে চেয়েছেন তিনি, অথবা জীবনকে কল্পনা করেছেন — অথবা করতে চেয়েছেন — একটা শিল্পকর্ম হিসেবে। ওয়াল্টার পেটারের ভাবধারায় এসময়কার লেখকেরা এতো প্রভাবিত ছিলেন যে, কোনো কোনো আখ্যান এমনও লেখা হল, যেখানে নায়ক একটা কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি, নির্মাণ ও উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। নায়ক বলছে, 'জীবনের প্রথম কর্তব্য হল যতটা সম্ভব কৃত্রিম হবার চেষ্টা করা। জীবনের দ্বিতীয় কর্তব্য কি, তা এখনো উদ্ভাবিত হয়নি'।[৫] আরেকজন নায়ক বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করছে, 'বাঁচা ? সে আবার কি ? আমাদের ভৃত্যেরাই তো ওরকম বেঁচে থাকার কাজ করবে।'[৬]

এতে সন্দেহ করা যাবে না যে, সমসাময়িক বস্তুবাদ ও পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া হিশেবে এই ধরনের নান্দনিকতাবাদ জন্ম নিয়েছিল। সেজন্যে এই নান্দনিকতা-বাদকে কেউ কেউ উপান্ত্য-ভিক্টোরিয় পর্বের পুঁজি ও বস্তুতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া হিশেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে সবাই যে, এ প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এমন নয়। উদাহরণ হিশেবে জোলা, ডিকেন্সের কথা বলতে পারি। নান্দনিকতাবাদ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে কবিদের। এর সঙ্গে রয়েছেন চিত্রশিল্পীরাও। মূলত প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি ও চিত্রশিল্পীরা জীবন থেকে শিল্পকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। কবিরা চাইলেন কবিতার মধ্যে সুন্দর সাঙ্গীতিক অভিঘাত সৃষ্টি করতে, এবং এক্ষেত্রে 'জীবন'কে তাঁরা একটা বড় বাস্তব বাধা মনে করেছিলেন। একধরনের ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি-কাতরতা থেকে তাঁরা 'শুদ্ধ কবিতা'র চর্চা করতে চাইলেন। ধ্রুপদী পুরাণের ব্যবহার, মধ্যযুগীয়তাবাদ, এবং রোমান্সে উৎসাহ নান্দনিকতাবাদ নামক কাল্টের উল্লেখযোগ্য প্রান্ত। এ ধারার গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের মধ্যে রয়েছেন টেনিসন, উইলিয়াম মরিস, রসেটি, সুইনবার্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে নান্দনিকতাবাদ ঝিমিয়ে পড়ে অনেকখানি। ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে বার্ন-জোনস, ডি. জি. রসেটি, উইলিয়াম মরিস ও জেমস ম্যাকনিল নান্দনিকতাবাদের সোচ্চার প্রবক্তা। কিন্তু ফরাসি নান্দনিকতাবাদী কবিদেরকে ইংল্যান্ডে যাঁরা জনপ্রিয় করেন, তাদের মধ্যে জর্জ মুর, আর্থার সাইমনস ও এডমাণ্ড গুজের নাম উল্লেখযোগ্য। নান্দনিকতাবাদের আরেক বিখ্যাত দীক্ষাগুরুর নাম অস্কার ওয়াইল্ড। নান্দনিকতাবাদের পাশাপাশি সেসময় দেখা দেয় বোহেমিয়ানিজম। বোহেমিয়ানিজমও ছিল বাণিজ্য সভ্যতা ও বণিক সমাজের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া।

নান্দনিকতাবাদে অনেক অতিরঞ্জন ছিল, সন্দেহ নেই। তবে এরই সঙ্গে সৌন্দর্যের আন্তরিক পিপাসাও ছিল। দীক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ যে, সৌন্দর্যের স্বাধীন মূল্য নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন, তার গুরুত্ব অগ্রাহ্য করা যাবে না।

'নান্দনিকতাবাদ' এক ধরনের বিশুদ্ধ শৈল্পিকতার অন্বেষা। এ থেকেই, প্রায় একই সময়ে, তৈরি হয় 'শিল্পী' বিষয়ে এবং 'শিল্প' বিষয়ে কতিপয় বিশিষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস। ইংরেজিতে 'art' শব্দটি তের শতক থেকে পাওয়া যায়। রেমণ্ড উইলিয়ামসের[৭] মতে, তের থেকে সতের শতকের মধ্যে, ইংরেজিতে, এ- শব্দটির প্রচলন থাকলেও এর অর্থ ছিল এক ধরনের দক্ষতা। এ দক্ষতা যে কবিতা চিত্র সঙ্গীতে সীমাবদ্ধ ছিল, তা মোটেও নয়। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাসে

'সেভেন আর্টস' নামে সাত ধরনের বিদ্যা ছিল — যেমন ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, বাগ্মিতা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যা। ষোল শতকে artist বলতে মূলত এসব বিদ্যায় বুৎপন্ন ব্যক্তিদের নির্দেশ করা হত। ষোল শতক পর্যন্ত artist ও artisan শব্দদ্বয় অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত, অর্থাৎ 'দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি'। অতঃপর সতের শতকে ছবি আঁকা, সমাধিগাত্র অঙ্কন ও ভাস্কর্যে দক্ষ ব্যক্তিদের শিল্পী বলা হত। দেখা যাচ্ছে, সতের শতকে 'শিল্পী' বলতে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষরকমের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে 'শিল্পী'কে এ ধরনের বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার রেওয়াজ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়নি। উনিশশতকে সমাধিগাত্র অঙ্কনকারীদের artist বলা হলনা, বলা হল artisan। এ হলো বিখ্যাত কারুশিল্প ও চারুশিল্পের তফাত। নবপ্রতিষ্ঠিত রয়াল একাডেমিতে জায়গা দেওয়া হলোনা artisanদের। উনিশ শতক থেকে আমরা জানলাম, শিল্পী হলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁর কাজ কেবল দক্ষতা বা নৈপুণ্যের ফল নয় — একইসঙ্গে যার মধ্যে কল্পনা, বুদ্ধির উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীলতার বিচ্ছুরণ রয়েছে।

নান্দনিকতাবাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তে আমরা দেখেছি কিভাবে ধীরে ধীরে সৌন্দর্যের ধারণা পরিবর্তিত, বিকশিত ও বিশিষ্ট হয়েছে। সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যধারণার ঐ বিকাশের সঙ্গে শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বিশ্বাসও বিন্যস্ত হয়েছে নতুন নতুনভাবে। শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির চূড়ান্ত বিভাজন তৈরি হয় এ প্রক্রিয়ায়। বাংলায় 'স্বভাবকবি' এবং 'স্বাভাবিক কবি' ব'লে শিল্প ও প্রকৃতির এই বিরোধকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

এবার আমরা কাজী নজরুল ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনাগুলোর একটা জরিপ হাজির করতে চাই। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে নজরুলের সুস্থির সুশৃঙ্খল ভাষ্য পাওয়া যায় না। নজরুল ইসলাম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা থেকে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেননি। যা বোধ করেছেন তাই সুযোগসুবিধে মতো তিনি বলেছেন। এসব বক্তব্য তাঁর অভিভাষণগুলোতেই[৮] বেশি পাই। এছাড়া সাহিত্য সৌন্দর্য শিল্পকলা সম্পর্কে তিনি তাঁর চিঠিপত্রে, বইয়ের ভূমিকায়, ব্যক্তিগত অভিরুচি-বাহিত ছোট ছোট নিবন্ধে বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেন। 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' নামের একটা মোটামুটি বড়ো প্রবন্ধেও তাঁর কিছু জরুরি অভিমত

ব্যক্ত হতে দেখি। একগুচ্ছ বিশেষজ্ঞের সহযোগ ও সমন্বয়ে প্রফেসর আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় 'নজরুল রচনাবলী'র যে চারটি খণ্ড বাংলা একাডেমী থেকে বেরিয়েছে, মূলত তার আলোকে আমরা নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাগুলো পুনর্গঠন করতে ইচ্ছুক। এসব ধারণাগুলোর একটা মোটামুটি আলেখ্য তৈরি করে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যানে অবতীর্ণ হব।

নজরুল ইসলাম নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুশৃঙ্খলভাবে যে কিছু লিখতে বা বলতে পারতেন না, এমন নয়। কিন্তু যখনই তিনি সৌন্দর্য ব্যাখ্যার সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, তখনই সমকালীন সমাজের হিন্দু-মুসলিম ডায়ালেকটিকের বিভিন্ন বাস্তবতা তাঁকে আক্রমণ করেছে। সেজন্যেই অনেক অসাধারণ সুন্দর কথা উচ্চারণ করার মুহূর্তে তিনি বহু মামুলি বিষয়ে[৯] মনোনিবেশ না করে পারেননি। তাঁর অভিভাষণগুলোর একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত ও সম্প্রীতির প্রসঙ্গ। তাছাড়া যে-কালে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, তখন বাংলা ছিল উপনিবেশের অন্তর্গত; শুধু বাংলা কেন, ফুলের জলসায় সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাওয়ার ট্র্যাজেডিও তখনই ঘটেছে, যখন পুরো ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ কলোনির অন্তর্গত। উপনিবেশ ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে কাজী নজরুল ইসলাম প্রধানতম শত্রু হিশেবে শনাক্ত করেন সাহিত্যজীবনের একেবারে সূচনালগ্ন থেকে। এসব বিবিধ বিষয় নজরুলকে বিশুদ্ধ নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যোপলব্ধিতে বার বার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ব্রিটিশ কলোনির সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ[১০] হিশেবে নজরুলের নান্দনিকতার পুনর্মূল্যায়ন তাই আজ অত্যাবশ্যক।

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে একটা স্মরণীয় আনন্দঘন দিবস। এ দিন নজরুল ইসলাম কলকাতার এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে বিপুল সমারোহের সঙ্গে সংবর্ধিত হন। 'নজরুল-সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ' — কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্র এস্ ওয়াজেদ আলী পাঠ করে শোনালে কবি অভিভূত হয়ে যান এবং একটা প্রতিভাষণ দেন। এ সংবর্ধনা যখন দেওয়া হয়, নজরুল ইসলামের অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ ততদিনে শুধু প্রকাশিতই নয় সংস্করণের পর সংস্করণও বেরিয়েছে। প্রথম ও প্রধান কবিতাগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), প্রথম গদ্যলেখার সংকলন "যুগ-বাণী" (১৯২২) ও প্রথম গল্পগ্রন্থ "ব্যথার দান" (১৯২২) একই বছরে পরপর প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি লিখে ফেলেন 'বিদ্রোহী'র মত বিখ্যাত কবিতা, যা ১৯২২

সালের জানুয়ারিতে ছাপা হয়। সংবর্ধিত হওয়ার পূর্বে তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত ও বিতর্কিত হয়। অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' সম্পাদনা ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার অভিযোগে নজরুল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন ১৯২৩ সালে। এরপর তিনি 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' নামক কাগজ সম্পাদনা পরিচালনা করেন। শুধু ব্রিটিশ রাজ নয়, সমকালীন হিন্দু-মুসলমানের একটা বিরাট অংশও নজরুলকে সহ্য করতে পারেনি। 'প্রবাসী' 'শনিবারের চিঠি' 'ইসলাম দর্শন' ও 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল বারবার আক্রান্ত হন বিশের দশকে। ১৯২৯ সালের মধ্যে নজরুলের নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো প্রকাশিত হয় : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩),'দোলনচাপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪), 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'পুবের হাওয়া' (১৯২৫), 'চিত্তনামা' (১৯২৫), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), 'ঝিঙেফুল' (১৯২৬), 'রুদ্র-মঙ্গল' (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭), 'বাধনহারা' (১৯২৭), 'বুলবুল' (১৯২৮), 'জিঞ্জীর' (১৯২৮), 'চক্রবাক' (১৯২৯)।[১১] নজরুলের প্রধান কবিতার সংগ্রহও প্রকাশিত হয়ে যায় ১৯২৮ সালে। এই তালিকা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, নজরুলের প্রধান প্রধান সাহিত্যেকর্ম ১৯২৯ সালে সংবর্ধিত হওয়ার পূর্বেই বেরিয়ে গেছে। সেজন্যে এলবার্ট হলে সংবর্ধনার যে জবাবী ভাষণ নজরুল প্রদান করেন, তার মূল্য ঐতিহাসিক। নজরুলের নিজস্ব সৌন্দর্যঅন্বেষা এ সময় পরিণত বলেই ধরে নিতে হবে। এ প্রতিভাষণে নজরুলের উত্তরকালীন শিল্পসাধনার সংকেত আমরা পাই। নান্দনিকতাকে কত প্রগাঢ়ভাবে তিনি আলিঙ্গন করতে চান, তার নক্ষত্রদ্যুতিও ভাষণের বিভিন্ন ইঙ্গিতে স্পষ্ট।

সংবর্ধনার জবাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর নজরুল ইসলাম বলছেন :[১২]

> একথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র 'Beauty is truth, truth is beauty'.[১৩]

তারপর বলছেন,

> আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি।[১৪]

দুই অনুচ্ছেদ পর কাব্যিকভাবে বলেছেন :

> যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে, তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।[১৫]

পরবর্তী অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে একটা অতীব অর্থপূর্ণ উচ্চারণ করেন কবি : 'আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি।'[১৬]

নজরুল ইসলাম নিজেকে কীটসের মত 'সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল' বলেছেন, কিন্তু সুন্দর কি ? সুন্দর বলতে তিনি কি বোঝেন ? একটা গানে কবি বলেছিলেন :[১৭]

> আমি যার নূপুরের ছন্দ
> বেণুকার সুর
> কে সেই সুন্দর কে ?

আলোচ্য প্রতিভাষণে কবি বলছেন :[১৮]

> আমি শুধু সুন্দরের হাতের বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানেরপথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধ-কূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

এখানেও 'সুন্দর' যে কে, তার পরিচয় কিন্তু পাচ্ছি না। তিনি বলছেন যে, সুন্দরকে তিনি বিভিন্নরূপে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন। আমাদের প্রশ্নও তাই যা তিনি পূর্বোক্ত গানে বলেছেন, 'কে সেই সুন্দর কে'?

সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু কথা আমরা আলোচনার গোড়ার দিকে উল্লেখ করেছিলাম। সেগুলো এ-সংক্রান্ত কিছু দার্শনিক/তাত্ত্বিক বিবেচনা মাত্র। তা থেকে এখানেও কিছু আলো ফেলা যেতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে নজরুল ইসলামের 'সুন্দর'কে বুঝে ফেলা যাবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। নিজের সুন্দরকে খুঁজে বার করতেই নজরুল ইসলামের দুই যুগ সময় লেগেছে। 'সুন্দর' নজরুল ইসলামের সকল উচ্চারণে এক প্রচণ্ড প্রসঙ্গ হিশেবে পুনরাবৃত্ত। এসব

কারণে একটু সতর্কভাবে বিষয়টির বিচার জরুরি। আরো একটি প্রসঙ্গ তিনি বার বার এনেছেন, তা হল 'সত্য'। অতএব নজরুলের সত্য ও সুন্দরের আবশ্যক ব্যাখ্যানের মাধ্যমে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মানচিত্রের খানিকটা রূপরেখা পাওয়া সম্ভবপর।

নজরুল ইসলামের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা দরকার, যাতে তাঁর সত্য-সুন্দরের ধারণা আরো স্বচ্ছ হতে পারে। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, কাজী নজরুল ইসলাম তাতে সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন। তাঁর অভিভাষণের এক জায়গায় তিনি বলছেন ঃ[১৯]

> সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে —
>
> সেই অসুরের জন্য।
>
> . . . .
>
> শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে — তাজমহল সুন্দর, কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয়, এ sublime মহিমাময়!

নজরুল ইসলামের মত অল্পশিক্ষিত লোক এখানে beautiful এবং sublime-এর শুধু তফাতই করছেন না, তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক অভিরুচি ও অভিমুখও ব্যক্ত করছেন। আমরা নিজেরাও দেখব, নজরুল ইসলামের নিজের সৃষ্টি কিভাবে beautiful আর sublime-এ ভাগ হয়ে গেছে।

নজরুল ইসলামের একটা নিবন্ধের নাম 'আমার সুন্দর'। নজরুল ইসলাম তন্ময় হয়ে 'সুন্দরে'র কথা বলেছেন । সুন্দরের কোনো স্বতঃসিদ্ধ রূপ নেই বলে, সুন্দরএকমাত্রিক নয়। নিবন্ধটি নজরুলের নিজের 'সুন্দর' অনুধাবনের এক অতীব মগ্ন পরিক্রমা। আমরা পর পর কিছু উদ্ধৃতি দিই ঃ[২০]

১. আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। 'ধূমকেতু', 'লাঙল' 'গণবাণী'তে, তারপর এই 'নবযুগে' তার শক্তি সুন্দর প্রকাশ এসেছিল;

২. এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালবাসলাম। মনে হল, এই আমার মা। তাঁর শ্যাম-স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা-নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত-উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে

উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমি রূপে।[২১]

৩. .... আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেন নি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।[২২]

৪. তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ সুন্দর হয়ে।[২৩]

৫. এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল- কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু-সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্বঅস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। কিন্তু শক্তি কোথায় পাই। কোথায় কোন পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের সংহার-সুন্দরের দেখা?[২৪]

এ নিবন্ধে নজরুল ইসলাম 'প্রলয়-সুন্দর'কে নিজের 'পূর্ব-চেতনা' হিশেবে চিহ্নিত করেছেন। বিষয়টির ব্যাখ্যায় ও প্রতীকায়নে নজরুল ইসলামের দর্শনমনস্ক অধ্যাত্মবোধ স্পষ্ট। মিষ্টিসিজম তো বটেই। নজরুল বলছেন যে, তাঁর লক্ষ্য পরম সুন্দরের সঙ্গে পরম বিলাস; কিন্তু তা কেবল ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে না। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে উর্ধলোকে যাত্রা সম্ভবপর হলেও, অসুর আর অশুভের সঙ্গে লড়াই ছাড়া সে যাত্রা সফল হবার নয়। পরম সুন্দরের দেখা পেতে হলে মাটি পৃথিবীর ঋণ শোধ[২৫] করতে হবে। বাংলার ঋণ শোধ করতে হবে। অর্থাৎ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আর সেকারণেই, নিবন্ধের শেষে তিনি বলছেন, প্রলয়-সুন্দরই তার কাম্য।

আমরা লক্ষ করবো, নজরুল ইসলাম বিভিন্নরকম 'সুন্দরে'র কথা এ নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের কথাও অব্যক্ত রাখেননি। কিন্তু এত কিছুর পরও 'সুন্দর' বলতে তিনি কি বোঝেন বা কাকে তিনি 'সুন্দর' বলেন, এর বিবরণ এতে আমরা দেখি না। নজরুল ইসলাম শক্তি-সুন্দর, স্নেহ-সুন্দর, শোক-সুন্দর, যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দর, প্রলয়-সুন্দরের কথা বলেছেন; এতে সুন্দরের বিভিন্ন উপলব্ধ রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, কিন্তু সুন্দরের 'সত্তা' আমাদের কাছে আরো অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রলয়-সুন্দরের আজ্ঞা মান্য করে পরম সুন্দরের সঙ্গে মিলনই তাঁর কাম্য, কিন্তু এ তথ্যটি জ্ঞাপনের জন্যে এ নিবন্ধ গুরত্বপূর্ণ নয়।

এর গুরুত্ব, বিভিন্ন সুন্দরের বৈপরীত্যে ও বৈচিত্র্যে নজরুলের প্রবল আকর্ষণ, কৌতূহল ও লিপ্ততায়।

এ্কথা মনে করার কোনো কারণে নেই যে, আমরা নজরুল ইসলামের মধ্যে সুন্দরের সংজ্ঞা[২৬] খুঁজছি। মোটেও নয়। সুন্দরের সংজ্ঞা দেওয়া শুধু নজরুলের কেন, কোনো শিল্পীরই কর্তব্যের আওতায় পড়ে না। শিল্পী যদি দেনও সংজ্ঞা, তাহলেই যে তা সর্বজনগৃহীত হবে এমনও নয়। যেসব শিল্পীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল, তাঁরা সুন্দর সম্পর্কে কথাবার্তা কম বলেননি। তবুও, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁদের কথা দিয়ে তাঁদের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি। কখনো বেশ কাজে লেগে যায় তাঁদের বক্তব্য, কিন্তু প্রায়ই লাগেনা। তাছাড়া কাজে যদি লাগেও শিল্পীর অভিমতের অনুকূলে তাঁদের কাজ ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাখ্যাটাই দরিদ্র হয়ে পড়ে। ব্যাখ্যা যদি দরিদ্র হয়, কিংবা শিল্পীর কিছু মতের সারসংকলন বা সারসম্প্রসারণ হয়, তাহলে 'ব্যাখ্যা'র নিজস্ব আইডেনটিটি কিছু থাকে না।[২৭] নজরুল ইসলামের 'আমার সুন্দর' নিবন্ধের কথাটাই ধরি। এ নিবন্ধ থেকে যদি এ সিদ্ধান্ত আমরা টানি যে, নজরুল ইসলামের লক্ষ ছিল পরম সুন্দরের সঙ্গে মিলন, এবং এ মিলনের কথাটাই তাঁর সকল সৃষ্টিতে মূর্ত হয়েছে –- তাহলে আসলে নজরুল ও তাঁর নান্দনিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হল না। অথচ কেবলই তাঁর বক্তব্যের অনুগামী হলে এ মীমাংসা তুলে ধরা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না।

পুনরায় আমরা আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি, তাহল 'সুন্দর' আসলে কি? ইতিপূর্বে অনেক দার্শনিক ও চিন্তাবিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি, কিন্তু 'সুন্দর' সম্পর্কিত ধারণা স্বচ্ছ হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'সুন্দর' একটা বহুআলোচিত প্রসঙ্গ। আলোচনা হয়েছে অনেক, কিন্তু মীমাংসা খুব হয়নি। মীমাংসা না হলেও অইসব ব্যাখ্যার সাহায্যে নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন প্রান্ত আলোকিত হয়েছে, সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে শিল্পের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শিল্পের ব্যাখ্যা। শিল্পের সমালোচনা ও ব্যাখ্যার নতুন মর্যাদা তৈরি হয়েছে।

'সুন্দর' কাকে বলে, 'সুন্দর' কোথায় থাকে, কাকেই বা বলব 'সৌন্দর্য', এসব বিষয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। কোনো কোনো আলোচনা বা তর্ক বেশ মনোজ্ঞ। শিল্পবিপ্লবোত্তর তথ্য মহাসরণির যুগে ওসব আলোচনার বিশেষ মূল্য

যদিও নেই, তবুও দু'একজনের বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করতে চাই। ক্রোচে দিয়ে শুরু করি।[২৮] ক্রোচে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, কোনো কিছুকে যখন আমরা সুন্দর বলি, তখন আসলে আমরা মনের একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার কথা বলি। কোনো বস্তু, বিষয়, প্রাকৃতিক উপাদানের সংস্পর্শে এসে আমাদের মস্তিষ্কের কোনো কোনো ফ্যাকাল্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন আমাদের মনে একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। যার সংস্পর্শে এরকম হল, তাকে আমরা 'সুন্দর' বলি, আর তার মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া হল, তাকে বলি সৌন্দর্যবোধ। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষের সক্রিয়তা ছাড়া, এবং ঐ সক্রিয়তার ফলে উদ্ভূত মনের প্রেরণা ছাড়া কোনো কিছু সুন্দর হয় না। ভারতীয় রসশাস্ত্রীরাও এ কথাটা বুঝেছিলেন; বিভিন্ন স্থায়ীভাবের সহযোগে রসের উদ্‌গম হওয়ার যে ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ঠিক এ কথাটা আছে।

পার্থক্য এই যে, ক্রোচে সৌন্দর্যের কোনো বহিঃসত্তা মানেন নি। কথাটা শুনতে হঠাৎ খটকা লাগে; কিন্তু আসলে তিনি বলতে চান, জড় আর প্রাণের বিশেষ একটা সংযোগ এবং মনের একটা অব্যবহিত প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া 'সুন্দরে'র জন্ম হয় না। ফলে 'সুন্দর' তাঁর মতে কোনো বস্তু নয়, কোনো শারীরিক ব্যাপার নয়; তিনি বারবার বলেছেন, beautiful is not a physical fact; it does not belong to things. মানুষের (তার মন ও মস্তিষ্কের) সক্রিয়তা ও প্রেরণা ছাড়া 'সুন্দর' হয়না, সৌন্দর্যের বোধও তৈরি হয়না। ক্রোচে সুন্দরের কোনো বহিঃসত্তা যখন মানেন না, তখন তাঁর ধারণায় সৌন্দর্যের বোধই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের বোধই সুন্দর। মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রোচে চার ধরনের 'বৃত্তি'র কথা বলেছেন, যার একটি হল 'নান্দনিক বৃত্তি'; ক্রোচে সুন্দরের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, এবং যেভাবে সৌন্দর্যের বোধ জন্ম নেওয়ার কথা বলছেন, তা মূলত মানুষের নান্দনিক বৃত্তিরই সম্প্রসারণ।

এখন প্রশ্ন হল, মন আর মস্কিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়া যদি 'সুন্দর' না থাকে, প্রকৃতিকে আমরা সকলে 'সুন্দর' বলি কেন? প্রকৃতির কোনো কোনো দৃশ্য এত নয়নাভিরাম মনে হয় কেন? এবং এর কোনো ব্যতিক্রম নেই কেন? ক্রোচে বললেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর মনে হওয়ার মধ্যে কোনো নান্দনিক অভিজ্ঞতা নেই। এ কোনো নান্দনিক আনন্দ নয়। এ হল, অনেকটা practical pleasure।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নান্দনিক আয়তনে বিন্যস্ত করতে হলে প্রথমে তাকে 'প্রকৃতি' থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন করতে হবে ঐতিহাসিক বহির্বাস্তবতা থেকে। মনের সংস্পর্শে এসে যখন প্রকৃতি সৌন্দর্যের অভিঘাত সৃষ্টি করে, কেবল তখনি তা সুন্দর। অর্থাৎ প্রকৃতি তখনই সুন্দর যখন একজন শিল্পীর চোখ তা দেখে। সেজন্যে প্রকৃতির এমনিতে কোনো সৌন্দর্য নেই; শিল্পীর চোখ আর মনই তাকে 'সুন্দর' করে তোলে। এমন কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকতে পারেনা, যাকে শিল্পী কোনো না কোনো ভাবে সংশোধন করে না নেন।

একই কারণে কোনো কবিতা বা কোনো ছবি আপনাআপনি সুন্দর হতে পারেনা। কবিতার ভাষার মধ্যে সৌন্দর্য নেই, ছবির বর্ণপ্রলেপনের মধ্যে সৌন্দর্য নেই। কেবল তখনই কোনো কবিতা বা ছবি সুন্দর, যখন সে কবিতা পড়ে বা সে ছবি দেখে আমাদের মধ্যে সেরূপ এক অন্তর্বৃত্তি জেগে ওঠে, নান্দনিক এক অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়। এরূপ অন্তর্বৃত্তি বা অভিজ্ঞতা জাগ্রত হয় বলেই, আমরা তাকে সুন্দর বলি। যদি না জাগতো, বলতাম না।

প্রশ্ন হল, ওরকম অন্তর্বৃত্তি বা নান্দনিক চৈতন্য জাগে কেন? কেন সব ছবি দেখে তা জাগেনা, কেন সব কবিতা পড়ে তা দেখা দেয় না? এই প্রশ্নের জবাবে নন্দনশাস্ত্রীরা বহু বাক্য ব্যয় করেছেন। ক্রোচে এক্ষেত্রে আমাদের খুব সাহায্য করেন না। কারণ তিনি বহির্বাস্তব স্বীকার করেন না, তাঁর কারবার মনোবাস্তবতা নিয়ে। অন্যদিকে সাধারণভাবে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, সৌন্দর্য এক আশ্চর্যজনক, অজ্ঞাত, ও অপ্রমাণযোগ্য ব্যাপার।

বিজ্ঞানের বিষয়আশয়কে যেভাবে প্রমাণ করা যায়, সৌন্দর্যের উপলব্ধি বা সুন্দরের জ্ঞানকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্রোচে বহির্বাস্তব-বিরোধী যে চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার কোনো দরকার নেই। তবে ক্রোচের সৌন্দর্য, চিন্তার সারবত্তা, কিছু হলেও, আছে। যখন কোনো কিছুকে আমরা সুন্দর বলি, কেন বলি? খুব বিচার ভাবনা করে তো বলিনা। অন্তত সবসময় বলিনা। বিচার প্রয়োগ করি ব্যাখ্যার সময়, উপভোগের সময় নয়। ক্রোচে যে বলেন, মানুষের মনকে অগ্রাহ্য করে সৌন্দর্যের কূলকিনারা পাওয়া যাবে না, এর মধ্যে 'সত্য' আছে। ক্রোচে যে বহির্বাস্তবের সংস্পর্শে মানবমস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন, তার মধ্যেও সত্য আছে।

আজকের দিনে আমরা কম্পিউটারের সফটওয়্যার দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ি। কম্পিউটারের সফটওয়্যার তো মানবমস্তিষ্কের আদলে গড়া। কম্পিউটারের সফটওয়্যারের চেয়ে অনেকবেশি বিস্ময়কর মানুষের মস্তিষ্ক। কম্পিউটারের প্রোগ্রাম আমরা বুঝি, না বুঝলে শিখে নিতে পারি; কিন্তু মানুষের মন ও মস্তিষ্ক কতটুকু আমরা বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। এমন কি বলা যায় না যে, যখন আমরা কোনো মহৎ কবিতা পড়ি, অসামান্য ছবি দেখি, অসাধারণ দৃশ্যের মুখোমুখি হই, তখন আমাদের মস্তিষ্কের কোনো কোনো কোষ অকস্মাৎ — সফটওয়্যারের চেয়েও দ্রুত গতিতে — সাড়া দিয়ে ওঠে। এই সাড়াকে আমরা বলি সৌন্দর্যের বোধ, কিন্তু এই সাড়া কেন ঘটলো, কোনো সংগতি ও সামঞ্জস্য এর উদ্দীপক হল, কেন কোনো কোনো মানুষের মন কোনো কিছুতে ওভাবে সাড়া দেয়, ওভাবে আক্রান্ত হয়, প্রাণিত হয়, অভিভূত হয়, কেন প্রকাশের আবেগ জেগে ওঠে, সৃষ্টির আকুতি বা চাঞ্চল্য তৈরি হয়, তা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারিনা। কিন্তু ব্যাখ্যা না করতে পারা আমাদের অজ্ঞতারই ফল, এর মধ্যে অবশ্যই কার্যকারণ আছে। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের পূর্বে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারে আমরা বিস্মিত ছিলাম, কিন্তু ফ্রয়েড দেখালেন সেসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের চেয়েও অনেক অনেক বেশি দুর্জ্ঞেয়, জটিল ও রহস্যময় হলো মানুষের মন। ফ্রয়েডের পাশাপাশি কার্ল গুস্তাভ য়ুং-এর আর্কেটাইপ ও নির্জ্ঞানের ধারণা আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, মানুষের মন ও মস্তিষ্কের চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নেই।

সুন্দরের সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের বোধের মধ্যে তরতম ভেদ আছে। সবার জীবনেই তো বহু ঘটনা ঘটে, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, কিন্তু সবাই তো কবিতা লিখতে পারে না, ছবি আঁকতে পারে না, সুর সৃষ্টি করতে পারে না। মহৎ কবিতা, ছবি, বা গান যে সবাইকে সমানভাবে স্পর্শ করে, এমন বলারও উপায় নেই। দৃষ্টি আর বোধে এই তফাত অবশ্যই রয়েছে, এবং থাকবে। এক ধরনের সংবেদনশীলতা ক্ষমতা ও প্রতিভা সৃষ্টির পেছনে কাজ করে। কেবল কল্পনা আর বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি হয় না, এর জন্যে দরকার দিব্যদৃষ্টি, প্রতিভা। আমাদের বক্তব্য অবৈজ্ঞানিক নয়। বহুপূর্বে ভারতীয় রসশাস্ত্রীদের কেউ কেউ সৌন্দর্যসৃষ্টির বিভিন্ন ফর্মূলা দিয়েছিলেন, সেসব ফর্মূলা অনুসরণ করে কোনো শিল্পীর জন্ম হয়েছে বলে শোনা যায় না। একইভাবে বহুগুণ উন্নত সফটওয়্যার ব্যবহার করে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে, কম্পিউটার-বিজ্ঞানীরা এমন উন্মাদ বক্তব্য এখনো দেননি।

'সুন্দরে'র ক্ষেত্রে কোনো স্বতঃসিদ্ধ ধারণা নেই। আমরা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ব্যাপারকে সুন্দর বলি। সৌন্দর্যের বোধ যে সবসময় খুব বিশুদ্ধ, এমনও বলা কঠিন। সৌন্দর্যের ধারণা, উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় অনেক অভ্যাস ও সংস্কার কার্যকর থাকে। সৌন্দর্যের বোধ বা সৃষ্টি 'সত্য', কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। সতঃসিদ্ধও নয়। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা তো নয়ই। একটা কথা কেউ কেউ বলেন, সৌন্দর্যের ধারণা যদি আপেক্ষিক হয়, 'মোনালিসা' সবার চোখে সুন্দর কেন? আসলে কি তাই? মোনালিসা কি সবার চোখে সুন্দর? 'তাজমহলের' মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শিল্পী কি মানুষের শ্রম, অর্থ ও ঐশ্বর্যের বিরাট অপচয় দেখেননি?

আমরা দেখব, একজন মহৎ কবি অসাধারণ সব কবিতা লেখেন, কিন্তু তিনি একইভাবে পৃথিবীর মহৎ ও অনন্যসাধারণ ছবির সৌন্দর্যে সাড়া দিতে পারেন না। অনেক বিদগ্ধ লোক এমন আছেন, যারা ছবি খুব বোঝেন, কিন্তু সেভাবে কবিতা বোঝেন না, সেভাবে গান বোঝেন না। কেউ গানে সাড়া দেয়, কিন্তু ছবিতে সাড়া দেয় না। কেন এমন হয়? এমনও তো হয় যে, একটা বয়সে আমরা কবিতা খুব উপভোগ করতাম, কিন্তু পরে আর করি না; এমনও হয় যে, একসময় ছবি খুব টানলেও উত্তরকালে তাতে আর সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এমন ভাবা কি খুব অসংগত যে, যেসব ইন্দ্রিয় একসময় সাড়া দিত বলে আমরা কবিতা বুঝতাম বা উপভোগ করতাম,তার ধার কমে গেছে পরে; এবং তখন অন্য ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে আমরা ছবির দিকে ঝুকেছি! কিংবা ছবি ছেড়ে সঙ্গীতের দিকে! কেউ কেউ আবার ছবি ছেড়ে কবিতার দিকে! ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া সৌন্দর্যের উপলব্ধি যখন সম্ভব নয়, তখন কোনো কোনো ইন্দ্রিয় কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় কাজ করা এবং না করার সত্য মানতেই হবে।

যে কথাটা বলতে চাইছি, তাহল নান্দনিক সৌন্দর্যের কোনো স্বতঃ সিদ্ধ রূপ নেই। সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের মনের সাড়া দেওয়ার এবং সাড়া পাবার ব্যাপার আছে। এই 'সাড়া'টা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত। কেন আমাদের মন সাড়া দেয়, কেন দেয় না — এটা বিজ্ঞান বলতে পারবে। এখনো বলেনি অবশ্য, তবে কোনোদিন হয়তো উদঘাটিত হবে–যখন সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের আজকের কাতরতা, মরমীমনা, রহস্যময়তা আর থাকবেনা। সৌন্দর্য বিষয়ে কাতরতা কি দিনে দিনে কমে যায়নি আমাদের ? আমারতো ধারণা, সৌন্দর্য বিষয়ে আমাদের উৎসাহ এবং

কৌতূহল আগের মত নেই। আমরা অতোটা নান্দনিক নই আজকের যুগে। পৃথিবীর সকল বিষয়-আশয়ে অনেক পরিবর্তন এসেছে, সেই পরিববর্তন নান্দনিক বোধেও সাড়া ফেলেছে। টেরি এগলেটন একটা বই লিখেছেন, The Politics of the Aesthetic[২৯] ; কেন ? এজন্যে যে, তিনি বলতে চান, সৌন্দর্যের খুঁটিনাটি ও রসের তর্ক বাদ দিয়ে এখন দরকার নান্দনিকতার অন্তর্গত রাজনৈতিকতার অধিবিচার। আখ্যানের ভাষার সৌন্দর্য বিচার করে লাভ নেই, সে বিচার অনেক হয়েছে; দরকার তার মধ্যে অন্তর্লীন রাজনীতি ও মতাদর্শের কারুকাজ পুনঃপুনঃ পরীক্ষা।

ঠিক এজন্যেই নজরুল ইসলামের স্বতন্ত্র নান্দনিক ও রাজনৈতিক চেতনা আমাদের বিস্মিত করে। নজরুল ইসলাম নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যসৃষ্টির সমস্ত হিশাব নিকাশ চুকিয়ে মিটিয়ে দেন তাঁর সুর ও সঙ্গীতে। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে, সেকারণে, নজরুল ইসলাম একজন চরিতার্থ শিল্পী। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। আমাদের সমস্যা হল, সঙ্গীত আমাদের ক্ষেত্র নয়। অনদিকে সঙ্গীত যাদের ক্ষেত্র, তাদের অদক্ষ বিশ্লেষণে নান্দনিক অর্থে চরিতার্থ নজরুল ইসলামের পূর্ণ স্বরূপ অধিগম্য হয় না। যতদিন পর্যন্ত নজরুলের সঙ্গীত উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করার জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তি আমরা না পাচ্ছি, নজরুল ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যের চূড়া হাতেকলমে বিচার করে দেখানো যাবে না।

নন্দনতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কেউ হয়তো ভাবতে চাইবেন, নজরুল ইসলাম পুরনো লেখক ঃ বাংলা সাহিত্যে তিরিশের দশকে যে বিশেষ ধরনের 'আধুনিকতা'র সূত্রপাত হয়, তার সঙ্গেও নজরুল ইসলামের যোগাযোগ অল্প। কাজেই নতুন সমালোচনাতত্ত্বের আলোকে নজরুলের সাহিত্য বিচারের যৌক্তিকতা কোথায়? যদি সত্যিই এরকম কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে বলতেই হবে বর্তমান সময়ের সমালোচনামূলক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। সমালোচনা কখনোই 'সমকালীন সাহিত্য' নিয়ে হয়না, যদিও খোদ সমালোচনাই হয়ে উঠতে পারে 'সমকালীন সাহিত্য'। সমালোচনা যে নিজেই একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য, এই বোধ থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা হল, পোস্টমডার্ণ বা পোস্ট-কলোনিয়াসিস্ট সমালোচনা[৩০] কিন্তু পুরনো সাহিত্যকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে, নতুন সাহিত্য নিয়ে নয়। নজরুল ইসলাম তীব্রভাবে সমাজ-রাজনীতি সচেতন

লেখক ছিলেন, নতুন সমালোচনাতত্ত্বের (নন্দনতত্ত্বের) দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেই তার লেখার প্রতি সুবিচার সম্ভবপর হবে।

কাজী নজরুল ইসলাম মন্ময় রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা দ্বারা তাড়িত হয়েছেন সবসময়। শেলী, কীটস্, বায়রণ, এবং বৈষ্ণব পদাবলী, এবং বাঙালির রোমান্টিক অধ্যায়ের [illegible] নজরুল ইসলামকে [illegible] দিয়েছে [illegible] ঔপনিবেশিক কালপর্বে ইংরেজি সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে বাঙালি লেখকদের অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে পরিচয় ঘটেছিল। কখনো গ্রন্থপাঠ, কখনো অনূদিত রচনা, কল্লোল-কালিকলম বাহিত পরিগ্রহণ, সমকালীন উল্লেখযোগ্য লেখকদের বিদেশী সাহিত্যের প্রতি উন্মুখিতা ও কৌতূহল, ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতি — এসব কারণে ইংরেজি ও ইউরোপিয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ঘটে। তবে সবলেখক সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেননি, সবাই সব প্রভাবকে সানন্দে স্বীকার করেন নি; অনেক লেখকই বিদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সমালোচনামনস্ক ছিলেন।

নজরুল ইসলাম ইংরেজি সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা এটুকু বুঝি, তিনি প্রয়োজনমতো এবং স্বভাবমতো ইংরেজি ও বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেন। কতদূর তিনি প্রাণিত হয়েছিলেন, আমরা জানি না; তবে যেটুকু হয়েছিলেন, স্বভাবসংগতভাবেই হয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ কলোনির শত্রু ছিলেন, উপনিবেশকে তিনি ঘৃণা করতেন — ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে গরিব মানুষের আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন তাঁর মধ্যে প্রকাণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমরা বুঝি, কেবল তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভবপর।

ক.[৩১] সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল-ফিতা।
[রক্তাম্বরধারিণী মা, 'অগ্নি-বীণা']

খ.[৩২] মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে,
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
[রক্তাম্বরধারিণী মা, 'অগ্নি-বীণা']

গ.[৩৩] নিদ্রিত শিবে, লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।
[রক্তাম্বরধারিণী মা 'অগ্নি-বীণা']

বিদ্রোহের কথাও যে কত সুন্দর উপমা, প্রতীক আর রূপকল্পে চিত্রিত করা সম্ভব, নজরুল ইসলামের অসংখ্য কবিতা তার দৃষ্টান্ত। তবে উপনিবেশ-বিরোধিতার রাজনৈতিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও নজরুল ইসলাম কবিতার [illegible] বক্তৃতা-ভাষণ দেননি। যদি তাই হতো, তাহলে এতগুলো সুন্দর কবিতা, অমন 'অগ্নি-বীণা', অত অত অসামান্য গান এবং সুর তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন না একদিকে কলোনি, অন্যদিকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম নজরুল ইসলামকে করে যেতে হয়েছিল। নজরুল ইসলাম রোমান্টিক স্বভাবের কবি[৩৪] ছিলেন, কিন্তু তীব্রভাবে রাজনীতি সচেতনও ছিলেন — আবার তাঁর মধ্যে, রোমান্টিক স্বভাবের কারণে, অনেক বৈপরীত্যও ছিল। নজরুল ইসলাম যে জেল-খাটা লেখক, এ কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে নজরুল ইসলাম কখনো আপোষ করেননি। কারাগারের দুঃসহ বন্দীজীবন, আমরণ অনশন, উপনিবেশ-বিরোধী সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে যে কোনো 'কবিত্ব' নেই, এ কথা আমাদের ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার, 'আনন্দময়ীর আগমনে' কিন্তু কবিতাই, তবু এর জন্যে নজরুল ইসলাম কারারুদ্ধ হন; এ কবিতার মধ্যে যে সর্বনেশে এক বিদ্রোহ আছে, ব্রিটিশদের তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি। একথা আজো আশ্চর্য লাগে, ভারতীয় পুরাণের অজস্র সংকেত আর অনুষঙ্গে ভরা এ কবিতাটিকে ব্রিটিশরা কিভাবে চিহ্নিত করতে পারল! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ উপনিবেশের অনুগত ভৃত্যেরাই এর পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ধার করেছিল ঃ

ক. আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূভারত আজ কসাইখানা, - আসবি কখন সর্বনাশী?

খ. রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশলো না মা অন্ধকারার বন্ধ ঘরে।

গ. বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়িগঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যুরাজায়।

ঘ. পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব-জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা-গুঁতো
দাঁড়ি নাড়ে ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাই কো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এসব বন্দী-গড়ে।

[আনন্দময়ীর আগমনে]

কবিতা বা আখ্যান লিখে যখনই নজরুল ইসলাম সৌন্দর্যের চর্চা করেছেন, সাহিত্য লিখেছেন, তখনই তাঁর মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা উঁকিঝুঁকি মেরেছে। অস্বচ্ছ রাজনৈতিক অবস্থান থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বাস করা সম্ভব নয়, এ ছিল নজরুলের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের কারণে নজরুলের রচনার রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে উঠেছিল। এই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার কারণেই নজরুল ইসলামের সৌন্দর্যবোধ, বিশেষত তাঁর সাহিত্যে, গভীরতার ব্যঞ্জনাকে বারবার বিঘ্নিত করে ফেলেছিল।

কমিটেড লেখকের পক্ষে সৌন্দর্যের সাধনা সবসময় সুখকর হয় না। ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই, কিন্তু সাধারণভাবে বাস্তবের সঙ্গে কমিটেড লেখকের সাহিত্যের একটা লড়াই বেধে যায়। কিন্তু নজরুল ইসলামের কমিটমেন্ট কি? নিশ্চয়ই কোনো দলীয় বিশ্বাস নয়। তবে তাঁর একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় ছিল, তা হল কলোনির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বাধীনতা, এবং আবদুল কাদিরের[৩৫] ভাষায়, spiritual communism — আধ্যাত্মিক ধনসাম্যবাদ। নজরুল ইসলাম 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) নামে বইও লেখেন, কমরেড মুজফফর আহমদের সংস্পর্শে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিতও হন, তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কমিউনিস্ট লেখক তিনি ছিলেন না। মিশেল ফুকোর কথা মনে পড়ে। মিশেল ফুকো তাঁর গুরু আলথুসারের লেখা বিখ্যাত 'রিডিং ক্যাপিটাল' পড়াতেন তাঁর দর্শনের ক্লাশে। একবার হিশেব করে তিনি বলেছিলেন, মোটের ওপর বছর চারেক আমি সমাজতন্ত্রী ছিলাম, আর পারিনি। সমকামী মানুষ আমি, আমার পক্ষে কি সমাজতন্ত্রের অনুশাসন মানা সম্ভবপর?[৩৬]

পরিচ্ছেদ দুই

কবিতার বাইরে অসংখ্য গান লিখেছিলেন যে নজরুল ইসলাম, তাঁকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে 'সুন্দর পতঙ্গের মতো'। বুলবুল বা বিহঙ্গ নয়, পতঙ্গ। এই উপমার মধ্যে একটা শক্তিশালী উদ্ভাসন আছে, এবং আমাদের ধারণা নজরুলের নন্দনতত্ত্ব পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে এই উদ্ভাসন কাজে লাগতে পারে।

নজরুল ইসলাম যে সময়ে কবিতা লিখেছেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি বাস করেন নি; সেজন্যে তিনি মরুভূমির স্বপ্ন, আরব পারস্য ও ভারতবর্ষের পুরাণ, ঐতিহ্যের শোভা ও ইতিহাসের কিংবদন্তী প্রভৃতিতে বিচরণ করেছেন। কলোনির নিগৃহের ভেতর নজরুল সাহিত্যচর্চা করেছেন, এবং ঔপনিবেশিক প্রভু-ভৃত্যের প্যারাডাইমের[৩৭] মধ্যে সুন্দর কবিতা লেখা তাঁর দৃষ্টিতে অপরাধ ছিল। এসব কারণে নজরুলের নান্দনিকতার একটা নিজস্ব উত্থানপর্ব আছে, এবং সেই উত্থানপর্বের বিরাট অংশ জুড়ে আছে উপনিবেশ ও তার ডিসকোর্স।

বাংলা সমালোচনায় 'নজরুল ইসলাম' একটা নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনগুলোতে নজরুল নিয়ে দোটানা আছে : আধুনিক সম্পাদকেরা নজরুলকে গ্রহণও করতে পারেননি, বর্জনও নয়। আধুনিকতার যে পোশাক ইতিমধ্যে তৈরি হয়, তার ডিজাইন নজরুল সাহিত্যের শরীরে ঠিক মানানসই ছিল না। কলোনির জটিল রাষ্ট্র যে ধরনের ব্যক্তির উৎপাদক, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো নজরুল ইসলাম ছিলেন তার বিপরীত। লোকপ্রিয়, জনবাদী, সামাজিক মনের সরল অংশে প্রতিশ্রুত নজরুল ইসলামকে বিদেশাগত আলোকপর্বের ঝকঝকে জ্ঞান দীক্ষিত করতে পারেনি।

এসব কারণে তৈরি হয়েছে নজরুল-সাহিত্য পাঠ করার বিভিন্ন সঙ্কট। নানাজন নানারকম নন্দনতাত্ত্বিক জ্ঞান ও প্রতিজ্ঞা থেকে অগ্রসর হয়ে নজরুলের বিভিন্ন পঠন (reading) প্রস্তাব করেছেন। আলোচনার সারাংশ অনেকটা এমন : নজরুল সময়ের দোষে বিশিষ্ট এক কবি। অর্থাৎ সময়ের কবি যতোটা নন, তার চেয়ে বেশি 'সাময়িক কবি'।[৩৮] নজরুলকে কেবল বিদ্রোহী বললে তার মানে এই

দাঁড়ায়। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সমাজে নজরুল ছিলেন উদ্দাম ও অমান্যকারী, পরম্পরাহীন ও উজ্জ্বল, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত কিন্তু দীপ্তবাক, সর্বোপরি সপ্রাণ লোকপ্রিয় ব্যক্তিপুরুষ : এসবের ফলে নজরুল ইসলাম সবসময়েই ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে।[৩৯]

উপনিবেশকালের লেখক ও মানুষ নজরুল ইসলাম নিজস্ব কোনো নান্দনিকতা তৈরি করেছিলেন কিনা, তার তদন্ত দরকার। তদন্তটা নতুন নয়, এবং তদন্তকারী সমালোচকের সংখ্যা অল্প নয়। তবে অধিকাংশ তদন্ত ও সমালোচনায় প্রায় অভিন্ন রীতি-পদ্ধতি অবলম্বিত ব'লে তাতে বৈচিত্র্য খুবই কম। নজরুল ইসলাম কারো কাছে 'নেগেশন', কারো চোখে 'অবসেশন' হিশেবে আবির্ভূত। তাই নজরুলের সমর্থক ও নজরুলের অসমর্থক — এরকম দুটো পক্ষ তৈরি হয়। এই ভাগাভাগির মধ্যে সরলতা, অজ্ঞতা, রাজনৈতিকতা, অস্পষ্টতা সবই আছে। সমালোচকেরা নিজেদের সাহিত্যধারণা ও সংস্কারকে নজরুলের টেক্সটের চেয়ে বেশি মূল্য দেন; নজরুলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে নজরুল-বিষয়ক অভিমত।

নজরুলের পক্ষাবলম্বীরা নজরুল বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যকে[৪০] বেশ মান্য করেন। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য নজরুল-সমালোচনার একটা অবসেশন। বুদ্ধদেবের মন্তব্য অনেকেরই আলোচনার এক স্বীকৃত, প্রচলিত, ও প্রচারিত প্রস্থানভূমি। নজরুল-বিষয়ক অনেক সমালোচনাকে তাই 'অভিযোগের উত্তর' বলে মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু উজ্জ্বল গদ্যে চিত্তাকর্ষক সাহিত্যালোচনার স্রষ্টা; বুদ্ধদেবের সাহিত্যবোধ ও তত্ত্ব, এবং এক ধরনের আধুনিক রোমান্টিকতা, এসব আমাদের সাহিত্যপ্রয়াসকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যাদর্শে বুদ্ধদেব বসু বিরাট এক সংকটের জনয়িতা। বুদ্ধদেবের অনুবাদের হাত ধরে বিদেশি সাহিত্যে আমাদের হাতেখড়ি, এ সত্যতো অস্বীকার করা যাবে না। নজরুল-সাহিত্যের আলোচনায় বুদ্ধদেবের মন্তব্য উল্লেখিত হতেই পারে, কেবল অবসেশনটাই অবাঞ্ছিত। চিন্তা নয় — নিজের বাক্যের ও গদ্যের সৌন্দর্যে বুদ্ধদেব প্রায়ই অভিভূত হয়ে পড়েন,এটা আমরা জানি। কিন্তু সংস্কারচালিত আনুশাসনিক মন্তব্যপ্রবণ সমালোচনার গুরুত্ব বাজার অর্থনীতির যুগে কি কমে যায় নি? বাক্যের নৈপুণ্য ও গদ্যের বিভা বুদ্ধদেবের প্রধান গুণ ও দোষ; সেজন্যে তিনি মন্তব্যপ্রবণ কিন্তু অনির্দিষ্ট, আত্মবিশাসী কিন্তু স্ববিরোধপূর্ণ, সিদ্ধান্তহীন, সর্বোপরি সাহিত্যের

অত্যন্ত পুরনো ও সীমাবদ্ধ একটা ধারণার প্রবক্তা বুদ্ধদেব বাক্য লেখেন ও উপভোগ করেন — তাঁর সমালোচনায় ব্যাপক অর্ন্তঘাত ও অন্তর্বিরোধের উৎস এই। নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মন্তব্য তাই মীমাংসিত হতে পারেনি। আমার কথা কারো কারো কাছে অবাক লাগতে পারে; তবে বুদ্ধদেবের গদ্যের প্রতিটি বাক্য, শব্দ, কমা-কোলন যতিচিহ্ন আমি যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, তার নিরিখেই আমার এ মন্তব্য। বুদ্ধদেবের বিরাট কৃতিত্ব ও মহত্ত্ব বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নেই, আমার প্রশ্ন বুদ্ধদেবের নির্দেশিত আধুনিকতাবাদের প্রকল্প নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের লেখার বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু নির্বাক, এটিও আমাকে সমান বিস্মিত করে। আধুনিক কবিতার সংকলনে বুদ্ধদেব বসু কেন নজরুল ইসলামের একটা গৌণ গান বাছাই করলেন, সেও এক জিজ্ঞাসা। নজরুলের একটা গান বাছাই করার মধ্যে বুদ্ধদেবের আধুনিকতা-বিষয়ক একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, আজকের দৃষ্টিতে যাকে বেশ কৌতুকাবহ ব'লে মনে হয়।

লেখকের জীবনকথার সঙ্গে মিলিয়ে তার সাহিত্য পাঠ করার অভ্যেস বেশ পুরনো। এ অভ্যেস ত্যাগ করা নানা কারণে অসম্ভব। জীবন ও সাহিত্যের জড়ানো মেলানো পাঠ নানাকারণে আকর্ষণীয়ও। নজরুলের জীবন এমনিতে খুব নাটকীয় ও বৈচিত্র্যময়, সেজন্যে তাঁর জীবনের আদলে সাহিত্যের ব্যাখা বিপজ্জনক হতে বাধ্য। প্রায় একযুগের মতো সময় সঙ্গীতের সাধনায় ব্যয় করেও নজরুলের পক্ষে নিজেকে 'গভীর শিল্পী'র ইমেজে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয়নি। নিজেই বলেছেন ঃ[৪১]

> 'আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে। .....আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে কাব্য হ'ল না, 'দোলন-চাঁপা' 'ছায়ানট' লিখলে বলে -ও হল ন্যাকামি, ও নিরর্থক শব্দ ও ঝঙ্কার দিয়ে লাভ কি? ও না লিখলে কার কি ক্ষতি !'

উপনিবেশের লেখককে নান্দনিক ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে, এ ছিল নজরুলের বিশ্বাস। উপনিবেশের নিগ্রহ, অমর্যাদা, গ্লানি ও দুঃখ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, এটি নজরুল ইসলাম সব সময় বোধ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি ছাড়াই নজরুল বুঝতে পারেন, কলোনির Self ও Other কখনো মেলেনা।[৪২] কলোনির শিক্ষিত ভৃত্য ইংরেজি শিখে Self হয়ে

উঠতে চায়, একে নজরুল ঠাট্টা করেছেন। ইংরেজি জ্ঞানের নির্দেশ ও প্রেরণায় 'অমর কাব্য' রচনা নজরুলের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

নজরুলের সাহিত্য জাতীয়তাবাদী[৪৩] নয়, মানবতাবাদী — এ কথা বারবার বলা হয়েছে। নজরুল পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করেছেন, তার মূল্য শাশ্বত — এসবও আমরা বলি। আমাদের মতে, নজরুলের লেখাকে অহেতুক বিমূর্ত করে তোলার দরকার নেই। কলোনির বিরুদ্ধে নজরুলের দ্রোহ খুব নির্দিষ্ট, তার আবেদন যদি চিরন্তন হয় তো হলো — না হলেও ক্ষতি নেই। কলোনির বিরুদ্ধে নজরুলের অবস্থান এত স্বচ্ছ এবং এত নির্দিষ্ট, এবং এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে চিরন্তনতার লেবেলে অস্পষ্ট করে তোলা বিভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তিকে অনুসরণ করে নজরুলকে কেউ কেউ 'মহাকবি'ও বলেছেন, এবং আমাদের বিবেচনায় এরও কোনো দরকার নেই। নজরুল মহাকাব্য যখন লেখেন নি, মহাকবির ইমেজও তাঁর জন্যে শোভন হবেনা।

কিন্তু কেন আমরা এভাবে ভাবি, তার একটা সমাজতত্ত্ব আছে। 'বড় কবি' 'ছোট কবি' — এভাবে না বললে আমাদের সুবিধে হয়না। এই ক্যাটেগরি কি ঔপনিবেশিক নয়? উপনিবেশের Self/other এবং প্রভু-ভৃত্যের মতাদর্শ থেকে কি একে বিচ্ছিন্ন করা যাবে? আমরা একবারও খেয়াল করিনা যে, যেসব সাহিত্যধারণা নজরুল বিচারে প্রয়োগ করা হয়েছে, নজরুলের সাহিত্যবিশ্বাস তার উল্টো। নজরুল কলোনি ও তার ডিসকোর্সের প্রবল বিরোধি, সেই ডিসকোর্সের আদলে নজরুলের বিচার কি হাস্যকর নয়! নজরুল অস্তিত্ববাদী লেখা লিখেছেন, অমর কাব্যের ফর্মূলা তাতে অচল ও অর্থহীন। তবে তাঁর 'অস্তিত্ববাদ' সাত্রীয় নয়; অস্তিত্বের 'অর্থ' আবিষ্কারের চেয়ে অস্তিত্বের 'ঘোষণা' ছিল তাঁর লক্ষ্য। অস্তিত্বের ঘোষণা কলোনির ভেতর কোনো সহজ ঘটনা নয়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় পাই ঃ[৪৪]

> আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
> মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
> ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম
> মম বাঁশরীর তানে পাশরি'
> আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
> আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
> ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।

নজরুল ইসলামের ভয়ে হাবিয়া দোযখ নিভে যায়, তাঁর রোষ মহাকাশ ছেপে ওঠে, তিনি অর্ফিয়াসের বাঁশরী — এসবের মধ্যে কি অতিরঞ্জন আছে? আপাতভাবে আছে হয়তো, কিন্তু নেইও। আসলে 'অতিরঞ্জন' এখানে কোনো প্রসঙ্গ নয়। নজরুল ইসলাম কলোনির খাঁচার ভেতর অস্তিত্বের ঘোষক হতে চেয়েছেন, এটাই মূল কথা।

নজরুল বলছেন ঃ[৪৫]

> আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
> আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ
> আমি বজ্র, আমি ঈশান বিষাণে ওঙ্কার,
> আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার

নিজেকে বর্বর (অর্থাৎ বেদুইন) এবং সভ্যতা ধ্বংসকারী (চেঙ্গিস) বলে নজরুল ইসলাম কি আসলে ঔপনিবেশিক সভ্যতার বিরুদ্ধেই লড়াইয়ের কথা বলছেন না? নিজেকে বজ্র কিংবা ঈশান বিষাণে ওঙ্কার বলে তিনি কি নিজের অস্তিত্বেরই প্রচণ্ড ঘোষণা দেন নি? উপনিবেশের ভেতর দারিদ্র, পরাধীনতা, আর অত্যাচারে মানুষ ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হতে থাকে; কলোনির মাপে ক্ষুদ্র হয়ে ওঠা এইসব মানুষকে নজরুল বলেছেন বীর, বলেছেন ঃ

> বল বীর
> চির উন্নত মম শির

তাত্ত্বিক শ্রেণীসংগ্রাম, কমিউনিজম, সম্পদের সুষম বন্টনের চেয়েও তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছিল আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন। কোনো রাজনৈতিক দলেই যে নজরুল স্বস্তি বোধ করেননি — তার কারণ এখানে।

আগেই বলেছি সাহিত্যপাঠের ধারণা, তত্ত্ব ও অভ্যেস বর্তমানে অনেক পরিবর্তিত। মহৎ শিল্পকলার প্রাক্তন আভিজাত্য ও কিংবদন্তী এখন জৌলুশহীন, নিষ্প্রভ। উত্তর-ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তিতে এখন জোর পড়ছে মার্জিনাল সাহিত্যের ওপর। এই মার্জিনাল সাহিত্যকেই 'প্রতিরোধের সাহিত্য' বা resistance literature[৪৬] বলা হচ্ছে আজ। পৃথিবীর ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের পটভূমিতে প্রতিরোধ সাহিত্যের স্রষ্টা হিশেবে—নজরুল সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। 'গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ'[৪৭] ও 'গ্রেট বুক্‌সে'র কিংবদন্তী এখন নেই; 'সাহিত্য'কেও এখন আর অভিজাত বিষয় মনে করা হয় না। 'সাহিত্য সমালোচনা'র স্থলে তাই 'ডিসকোর্সের অধিবিচার' গড়ে উঠেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে উপনিবেশের ডিসকোর্স অমান্য করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন। তাঁর নান্দনিকতা তাই উত্তর-ঔপনিবেশিক। এ নান্দনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ। নজরুল ইসলাম প্রভু-প্রজার ক্ষমতা-সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করেছেন, এবং এর জন্যে তাঁর সাহিত্য, প্রচলিত নন্দনতত্ত্বের বিচারে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে নজরুল ইসলাম যে মোটেও অচেতন ছিলেন না, সেটিই মজার বিষয়।

উপনিবেশের মধ্যে আত্ম-পরের বিবাদ ছাড়াও ক্ষমতা-অনুশীলনের একটি বিশেষ শৃংখলা থাকে। ভাষার নিয়ম অবিন্যস্ত করে নজরুল ইসলাম অই শৃংখলার প্রতি তাঁর আক্রমণ পরিচালনা করেন। নজরুলের ভাষা তাই কেবল 'ভাষা' নয়, তার মধ্যে একটি স্ট্রাটেজি এবং কৌশল আছে। নজরুল ইসলাম ভাষাকে বহুভাবে সম্প্রসারণশীল করে তুলেছেন; প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ভাষিক অনুশাসন স্বীকার করেননি; 'বাংলা'র উপর সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে তার গুণগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন এনেছেন ঃ[৪৮]

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার—

[কাণ্ডারী হুঁশিয়ার]

অন্যত্র বলছেন ঃ[৪৯]

উরজ্ য়্যামেন নজদ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম—'
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম!
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর, হাতে 'আব-জম-জম-জাম'।

অন্যত্র বলছেন ঃ[৫০]

আবুকবর উস্মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান — লা শরীক আল্লাহ্!

একই নজরুল ইসলাম আবার 'বিদ্রোহী' কবিতায় বলছেন ঃ[৫১]

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন'

এসব উচ্চারণে নজরুল ইসলামের কবিতার ব্যক্তিত্ব ও ভাষার স্বভাব ধরা পড়ে। আমরা বুঝি, নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার ভাষা, ধ্বনি ও স্বভাবে যে পরিবর্তন আনেন, তার সঙ্গে অন্যদের মিল অকিঞ্চিৎকর। নজরুল ইসলাম য়ুং-ব্যাখ্যাত সামূহিক নির্জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় নিজের মধ্যে বিচিত্র ও বিবিধ ঐতিহ্যের পরিগ্রহণ করেছেন এবং নানারকম ঐতিহ্য তাঁর চেতনায় এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে তা আজো আমাদের বিস্মিত করে ঃ[৫২]

বন্ধু, বলিনি ঝুট
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

নজরুলের কবিতা বিস্তারধর্মী। বক্তব্যকে তিনি পংক্তির পর পংক্তিতে ভাগ করে চলেন ইমেজ ও প্রতিমায়। নজরুলের সবসময়েই পাঠক আছে সামনে, এবং তিনি আলাপ করছেন ঃ তাঁর কবিতা পড়ে এইরকম মনে হয়। এর কারণ হলো, নজরুল-সাহিত্যের মূল প্রেরণা এসেছে ফোকলোর থেকে। লোকমনের ইঙ্গিত, সংকেত, ভাষা ও ভাববিশ্ব অপরূপ দক্ষতায় তিনি অনুবাদ করতে জানতেন। এজন্যই তাঁর ভাষা অনেক উপকরণকে একত্র করে মিখাইলবাখতিন[৫৩] কথিত 'কার্নিভালের পরিস্থিতি'[৫৪] তৈরি করেছে। নজরুলের কবিতার এই সপ্রাণ ডায়ালজি, পলিফনি বা বহুজবানি তাঁর কাব্যকে জনপ্রিয় করে। তাঁর কবিতায় উত্তম-পুরুষ 'আমি'র ব্যবহার বিপুল; কিন্তু তাঁর কবিতায় আত্মরতি নেই। সবসময় এক অথবা অনেক পাঠকের কথা মনে রেখে তিনি লিখেছেন। তিনি সত্য খুঁজেছেন সংলাপ ও পলিফনির বিস্তারের মধ্যে; এবং 'সত্য' তাঁর চোখে সমগ্র বা শেষ কথা নয়, বিভিন্ন ও বিবিধ। নজরুলের কবিতার এই বহুস্বর গুরুত্বপূর্ণ।

নজরুলের কবিতার এই বহুস্বর ঔপনিবেশিক সময়পর্বে তাৎপর্যপূর্ণ। এই পলিফনি এসেছে ভাষা থেকে এবং লোকঐতিহ্যের ঐশ্বর্য থেকে।[৫৫] উপনিবেশের

ডিসকোর্স[৫৬] যে 'সম্মতির কর্তৃত্ব' তৈরি করে নজরুল ইসলাম তা মানেন নি। ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের বিপরীতে তাঁর যাত্রা। উপনিবেশের ভেতরে 'উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স' তৈরি করার ক্ষমতা নজরুল ইসলামের মধ্যে ছিল।

একটা সময় ছিল যখন 'কবির জীবনী' জানা থাকলে কবিতা ভাল বোঝা যেত, আজকের দিনে ওসবের বিশেষ মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোর বাড়ি ছেড়ে জাহাজপথে ফেরার সময় 'পূরবী'র কবিতাগুলো লেখেন, কেবল এই একটি তথ্য দিয়েও অই কবিতাগুলোর ভাষ্য তৈরি করা যায়। করেছেনও কেউ কেউ, কিন্তু এভাবে ঠিক কোনোকিছু পড়া হয় না। এভাবে পড়লে 'পূরবী' না পড়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি তথ্য পড়বো, জাহাজ মহাসাগর সূর্যাস্ত পড়বো, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাকম্পিত প্রেম আকর্ষণ স্পর্শের ভয় অনুরাগ আকুতি পড়বো; তখন টেক্স্ট না পড়ে দুটো মানুষের সম্পর্কের গল্পই পড়া হবে কেবল।

নজরুল ইসলামের জীবন কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তাঁর জীবনের অধিকাংশ এখনো অজ্ঞাত অথবা রহস্যের জটাজালে আবৃত। নজরুলের জীবনের শুরু দেখে আন্দাজ করা মুশকিল তিনি কোনো জায়গায় পৌঁছুবেন পরে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেককিছু জানিনা বা জানতে পারিনা বলে আমরা আক্ষেপ করি, কিন্তু নজরুলের জীবনের কতটুকু আমরা জানি? তাঁর প্রথম বিবাহ, আপন মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, অসংখ্য নারীর সঙ্গে তাঁর নানারকম সংশ্রব, আধ্যাত্মিক সাধনা এসব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনো সংশয়াচ্ছন্ন।

১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন থেকে ফিরে নজরুল কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র বাড়িতে ওঠেন এবং তারপর চুরুলিয়া যান। চুরুলিয়ায় নজরুল এক সপ্তাহ থাকেন এবং পুনরায় কলকাতায় ফেরেন। বিশেষজ্ঞদের লেখা থেকে জানতে পারি, নজরুল ইসলাম আর কখনো মা'র কাছে যাননি। নজরুল যখন হুগলী জেলে তখন তাঁর মা জাহেদা খাতুন দেখা করতে আসেন চুরুলিয়া থেকে, কিন্তু নজরুল মা'র সঙ্গে কোনো কথা না বলে সেলের ভেতর চলে যান।

নিজের বাবার মৃত্যুর পর চাচাকে বিয়ে করায় নজরুল ক্ষিপ্ত হন মায়ের ওপর; কিন্তু শুধু এ কারণের জন্যে নিজের মায়ের সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, এমন বলা যাবেনা। এর মধ্যে আরো অনেক রহস্য আছে, যার কিছুই আমরা জানি না।

বন্ধু, সতীর্থ ও শিষ্যেরা নজরুল ইসলামের যে স্মৃতিকথা লিখেছেন, তার মধ্যে নজরুলের বাইরের রূপটাই আমরা দেখি। নজরুল ইসলামের জীবনের গভীর ও গুরুতর অংশগুলোর ওপর আলোসম্পাত ওতে নেই। থাকা সম্ভবও ছিলো না, কারণ নজরুল ইসলাম জীবনের গোপন রহস্যঘেরা বিষয়গুলো কাউকে জানতে দেননি। স্মৃতিআলেখ্যসমূহ থেকে নজরুলের বাইরের জীবনটাই আমরা জানতে পারি, ভেতরের মানুষটাকে নয়। প্রচণ্ড হাসি আর জর্দা-পানের তাণ্ডবে আকাশ ফাটিয়েছেন যে কবি, তাঁর জীবনের সামান্য — অতি সামান্য — অংশই আমরা জানতে পেরেছি। নজরুল ইসলাম যে ক্রমশ গভীর সঙ্গীতসাধনা আর নির্জনের আধ্যাত্মিক তপস্যায় চলে যাবেন, তা তো খুব স্বাভাবিক।

নজরুল ইসলাম তাঁর জীবন বা সম্পর্কের বর্ণনা কবিতায়[৫৭] দেন নি। তিনি ঘটনাকে ইমেজে পরিণত করেছেন, অনুভবকে প্রতীকে আন্দোলিত করেছেন, বিরাট প্লাবনকে ছন্দে সংহত করেছেন। সমকালের অনেক নারীর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ছিল, তাদের সঙ্গে তাঁর শারীরিক সংশ্রবও কম ছিল না, কিন্তু তার উল্লেখ কোথায়? জীবন থেকে সাহিত্যকে এতোটা বিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছিলেন যে কবি, তাঁর টেক্স্টকে আমরা কেন অতোটা জড়িয়ে ফেলি ঐ মানুষটার সঙ্গে?

অবশ্য জড়িয়ে ফেলার সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক কারণ আছে। উপনিবেশের ভেতর নজরুলের মতো দৃঢ়চেতা প্রতিভাবান বীর্যবন্ত কবি-ব্যক্তিত্ব দুর্লভ ছিল। যাঁরা নজরুলের সমকালে জীবিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে কটাক্ষ করেছেন, তাঁরা তাঁর সামনে নির্বাক ভৃত্যের মতো বসে থাকতেন। আরেকটা কারণ হলো, বাংলা সমালোচনায় যে কথাটি একবার প্রচারিত হয়, তা কিংবদন্তীতে পৌঁছুতে সময় নেয় না। কাজী নজরুলের ক্ষেত্রে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক মুহূর্তে নজরুল ইসলামকে তাই ভিন্নভাবে পড়া দরকার। উপনিবেশের ভেতর দরিদ্র ঘরের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষাহীন একজন বাঙালি কবি সুন্দর কবিতা লেখাকে অপরাধ মনে করছে, এর তাৎপর্য আছে। আবার, যে নজরুল ইসলামের 'লেখা'র চেয়ে বড় কোনো 'ক্ষমতা' ছিল না তিনিই দিনের পর দিন অনশনে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যান, এ তথ্যটিও প্রয়োজনীয় কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বুঝে নেওয়া জরুরি। নজরুল ইসলাম কলোনির ইংরেজিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা, ও

ইংরেজি কবিতার সমকালীন কারুবিধি প্রত্যাখ্যান করেন। উপনিবেশের বিরুদ্ধে নজরুল তাঁর কবিতাগুলোকে হাতিয়ারের মতো দাঁড় করাতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন; আধুনিক কবিতা তিনি লিখতে চাননি। আধুনিক কবিরা যেসব রমণীর কটাক্ষেই মূর্ছা যেতেন, ওরকম অনেক নারী নজরুলের বাহুডোরে বাঁধা ছিল — তারপরও নজরুল ইসলাম 'আধুনিকতা'র পূজো দিতে সম্মত হননি। নজরুল ইসলাম বই পড়ে প্রেমের কথা শেখেন নি এবং লেখেননি — এসব কথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

নজরুল ইসলামের সৃষ্টির বৃহদংশ 'প্রতিরোধ সাহিত্যে'র অন্তর্গত; উপনিবেশের ডিসকোর্স থেকে উদ্ভূত ও বিকশিত নন্দনতত্ত্ব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর সাহিত্যকে যদি 'প্রতিরোধের সাহিত্য' বলি, তাঁর নন্দনতত্ত্বকে 'প্রত্যাখ্যানের নন্দনতত্ত্ব' বলা যায়। এ ধরনের সাহিত্য উপনিবেশ ও উপনিবেশ-উত্তর কালে জগত জুড়ে লেখা হয়েছে, কেবল অতি-আধুনিক লেখকেরাই তা খেয়াল করেন নি। এ ধারার সাহিত্যের স্বাধীন স্বতন্ত্র স্ট্যাটাস সত্ত্বেও পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাহিত্যবিভাগে এর উপযুক্ত স্বীকৃতি জোটেনি। ফরাশিরা এখনো কি 'ফ্রাঙ্কোফোন লিটারেটার'কে গুরুত্ব দেয়? ইংরেজিতে রচিত আফ্রিকী ও ক্যারিবিয় সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার এখনো উপেক্ষিত। আমেরিকান স্টাডিজ প্রোগ্রাম থেকে সাউথ আমেরিকান টেকস্টগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার রেওয়াজ অনেক দিন থেকে চলে আসছে। এমনকি তুলনামূলক সাহিত্যেও গোলার্ধের উত্তরাংশের সাহিত্যকে একমাত্র মানদণ্ড ধরা হয়। সেজন্যেই মরক্কোর লেখক আবদুল কবির খতিবি তাঁর 'Maghreb Pluriel' বইতে প্রশ্ন তোলেন এই বলে যে, যদি 'deconstruction' একটা ঘটনা হয়, এবং 'decolonization' আরেকটা ঘটনা — তাহলে দুই ঘটনার মধ্যে অবশ্যই একটা মতাদর্শিক সংগতি আছে; সেই সংগতিকে উপেক্ষা করলে 'ডিকনস্ট্রাকশনে'র সত্যিই কোনো মানে হয় না। আজকে তাই আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যকে নতুনভাবে বিন্যাস করা হচ্ছে, এবং আমাদের বিশ্বাস, সেই সাহিত্যের অনুক্রমে নজরুল ইসলামের নাম গৌরবের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে।

'প্রতিরোধ সাহিত্য' একমাত্রিক কোনো ব্যাপার নয়। এর অভিব্যক্তি বিচিত্র, পরিসরও বিরাট। একটা লোককথাকে চিনুয়া আচিবি 'Things Fall Apart' (লন্ডন,

১৯৫৮)-এ যেভাবে বিন্যাস করেন, নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা'তে (১৯২২) একই বার্তা ভিন্নভাবে আছে। প্রতিরোধ সাহিত্যের প্রধান বার্তা উপনিবেশ-বিরোধী; তবে মজার ব্যাপার হল, অনেক সময়— এমন কি অধিকাংশ সময় — ঔপনিবেশিক ভাষায় উপনিবেশের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। ইংরেজি, ফরাশি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ভাষায় অনেক অসামান্য উপনিবেশবিরোধী সাহিত্য রচিত হয়।

ফিলিস্তিনের সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে ওই দেশেরই লেখক-সমালোচক গাসান কানাপানি ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম 'resistance' (মুকাওয়ামা) শব্দটি ব্যবহার করেন। ফিলিস্তিনের লেখকেরাই প্রথম 'দখল' আর 'নির্বাসনে'র সাহিত্যের কথা উচ্চারণ করেন। প্রতিরোধ সাহিত্যের এ হলো তাত্ত্বিক প্রস্থানভূমি। সারাপৃথিবীতে অন্যায় অধিকারের বিরুদ্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে, সবই প্রতিরোধ-সাহিত্যের অন্তর্গত।

একটা জিনিশ খেয়াল করা দরকার। নজরুল ইসলাম যে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের কথা বলেছেন, তা শারীরিক নয়, সাংস্কৃতিক। 'যৌবন'কে নজরুল ইসলাম একটা সাংস্কৃতিক প্রতিবাদী প্রতিপাদ্য মনে করতেন, সেজন্যেই ভারতীয় পুরাণকে 'বিদ্রোহী' করে তোলা সম্ভবপর হয়েছে তাঁর পক্ষে। সেজন্যেই এমন এক বাংলা ভাষা তাঁকে তৈরি করতে হলো, যা ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের পুরাণকে সমান সৌন্দর্যে আলিঙ্গন করতে পারে। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর যে শৃঙ্খলা ও সজ্জা সমকালীন বাংলায় তিনি লক্ষ করেছিলেন, তাকে আমূল বদলে ফেলার একটা প্রতিজ্ঞা তাঁর ছিল। নজরুলের বিদ্রোহ ও যৌবনবাদকে কেবলমাত্র শারীরিক ব্যাপার ভাবা যাবে না।

নজরুল ইসলাম প্রতিরোধের সাহিত্য ও প্রত্যাখ্যানের নন্দনতত্ত্ব উত্থাপন করেন। নজরুলের নন্দনতত্ত্বের ও নান্দনিকতার মূলে তাই প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধ। যে সময়ে নজরুল লিখেছেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি বাস করেননি; কেননা সময়টা তাঁর নিজের ছিল না, সময়টা বাঙালির ছিলনা, সময়টার শাসক ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। পরাধীন সময়ে সুন্দর কবিতা লেখাকে তিনি অপরাধ ভেবেছেন সেজন্যেই। সাহিত্যকে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অস্ত্র হিশেবে তিনি দেখেন, এবং এতে তাঁর লজ্জা নেই। নজরুলের লেখায় যৌবন ও যৌবনবাদের যে

প্রতীকী সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে, তা বোঝা দরকার। ঔপনিবেশিক পর্বে তাঁর নিজের ও সকল বাঙালির সময়টা অন্যের অধীন ছিল বলে নজরুল ইসলাম স্বাধীনতার পরিসর খোঁজেন বিভিন্নভাবে ঃ তাঁর পুরাণযাত্রা, ইতিহাসবিহার, আদিরূপাত্মক কল্পনা, ইউটোপিয়া সবই অই স্বাধীনতার স্বাদ নেওয়ার আকুল অতৃপ্ত আগ্রহজাত। শরীরের জোরে কলোনির কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করা যায় না, এটি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো[৫৮] নজরুল ইসলামও জানতেন; সেজন্যেই নজরুলকে তৈরি করতে হয় যৌবনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধাত্মক ইমেজ। বিদ্যমান, আচরিত, ও প্রায় নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ডিসকোর্স এবং তার সূত্রে গড়ে ওঠা ভাষার স্ট্রাটেজি একারণেই তিনি বদলান। প্রভু-ভৃত্যের নির্দিষ্ট সম্পর্ক-শৃঙ্খলায় নজরুলের ভাষা ও পলিফনি তাই পলিটিক্যাল। এভাবেই নজরুলের টেক্স্টের নতুন বেগানা নান্দনিকতা ও রাজনৈতিকতা তৈরি হয়েছে।

পরিচ্ছেদ তিন

ইংরেজি 'এসথেটিক্স'-কে 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' বা 'সৌন্দর্যের বিজ্ঞান' বলা হয়েছে, 'সৌন্দর্য' কি, তার বিচার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে, এবং তা দর্শনের এক বড় প্রসঙ্গ। 'সৌন্দর্যে'র মতো 'সত্য'কেও পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং বলা বাহুল্য, দুটোই অমীমাংসিত। সৌন্দর্য ও সত্য তাই মানবিকশাস্ত্রে সিদ্ধান্তহীন দুটো প্রত্যয়। তা হলেও, এ দুটো প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে যে আলোচনা, ব্যাখ্যা ও দার্শনিক অনুসন্ধানধারা গড়ে উঠেছে, তা আকারে ও প্রকারে বিপুল।

দর্শনশাস্ত্রকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যাস করার কোনো তাত্ত্বিক মূল্য নেই। তবু এই শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আমরা দেখি। নন্দনতত্ত্ব দর্শনের তেমনি একটা গুরত্বপূর্ণ বিভাগ। অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে আছে ন্যায়, পরাতত্ত্ব, জ্ঞান ও নীতিবিদ্যা। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে নন্দনতত্ত্বের উদ্ভব নতুন হলেও, নান্দনিক বোধ যথেষ্ট প্রাচীন। ঠিক নন্দনতত্ত্ব কথাটি নেই কিন্তু সৌন্দর্য আস্বাদনের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা আছে, এমন লেখাপত্র 'আধুনিক' নামক প্রচলিত কালবিভাগের অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। ওসব আলোচনাকে আমরা 'theory of taste' অথবা 'criticism of taste' বলে জানি।[৫৯]

মানুষের মধ্যে প্রশ্ন, বিচার, তুলনার একটা মানসিকতা প্রাচীনকাল থেকে ছিল। মানুষ বিভিন্ন বিষয়, বস্তু, বিশ্বাসকে বিচার করে দেখেছে, প্রশ্ন করেছে, তুলনা করেছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন জিনিশকে ভাল বলেছে, মন্দ বলেছে, সুন্দর বলেছে, কুৎসিত বলেছে। ভাল বা মন্দ, সুন্দর বা অসুন্দরের কথা বলতে গিয়ে তৈরি হয়েছে তর্ক, যাকে ইংরেজিতে 'আরগুমেন্ট' বলা হয়। নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় এসব তর্ক ও তার উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। যেমন যা সুন্দর তা সাবলাইম কিনা, যা অপূর্ব তা লোকোত্তর কিনা, যা লোকোত্তর তা উপযোগী কিনা, যা উপযোগী তা সত্য কিনা। ভেবে দেখা হল, সুন্দর এবং সাবলাইমের মধ্যে তফাত কোথায়? দর্শনে এ-ও এক জিজ্ঞাসা যে, বিচারের এমন কোনো নিরিখ থাকা সম্ভবপর কিনা যা দিয়ে 'নান্দনিক প্রমূল্য'কে

সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কিংবা একটা নান্দনিক নিরিখকে অন্য নিরিখের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। একটা পর্যায়ে 'এথিক্‌স' ও 'এসথেটিকসে'র সমস্যাকে সমান্তরাল ভাবা হল কেউ কেউ অবশ্য 'নীতি' ও 'নন্দনতত্ত্বে'র তুলনাকে অবান্তর বলেছেন, এবং এ ধরনের তুলনাকে 'একটা বৃহৎ ভুল প্রস্তাবে'র বেশি কিছু মনে করেন নি। অন্যেরা বললেন, দু'য়ের মধ্যে তুলনা শুধু সম্ভবপরই নয়, সঙ্গতও। বললেন, প্রমূল্যের এমন একটা সাধারণ তত্ত্ব দাঁড় করানো যেতে পারে যা — সামান্য মার্জিত করে — নন্দনতত্ত্ব, অর্থবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপর।[৬০]

ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) কথা আগেও বলেছি। কান্ট মনে করেন, সৌন্দর্যকে কোনো 'ধারণা' বা 'কনসেপ্ট' দিয়ে ধরা যায় না।[৬১] সৌন্দর্য হলো, উদ্দেশ্যমূলকতার এমন একটা উপলব্ধ রূপকল্প যার মধ্যে উদ্দেশ্যের উপস্থাপন অবিদ্যমান; অর্থাৎ অভিপ্রায়ের উপস্থাপন ছাড়াই যার মধ্যে অভিপ্রায়মূলকতা রয়ে গেছে। অভিপ্রায়ের কথা বলে কান্ট ইঙ্গিত করেছেন সৌষম্য ও সঙ্গতির প্রতি; ইংরেজিতে যাকে 'হার্মনি' বলে। বলা বাহুল্য, হার্মনি অনুধাবনের জন্যে কোনো 'অভিপ্রায়' থাকার প্রয়োজন নেই। কান্টের মতে, মানুষের মস্তিষ্ককোষে উপলব্ধি আর কল্পনার যে অন্তর্নাট্য চলে এবং তার ফলে যে বোধ জাগ্রত হয়, তাই নান্দনিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বে সূত্রবদ্ধ করা কঠিন। মানুষের মধ্যে কেন সৌন্দর্যের বোধ জাগ্রত হয় কিংবা কিভাবে জাগ্রত হয়, তার আলোচনা পূর্বে করেছি। তারই সূত্র ধরে উত্তর-গ্রন্থনবাদী সমালোচক জেওফ্রি হার্টমানের নিম্নোক্ত মন্তব্য[৬২] পাঠ করা যেতে পারে ঃ

> 'My experiences are not those of a trained philosopher but of a reader fascinated by a phenomenon to which the name 'aesthetic' was assigned only in the eighteenth century; a phenomenon, nevertheless, that is as clear in its effect if unclear in tis structure'...

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ও সৌন্দর্যবোধের মন্ময় নিয়মগুলোর অনুসন্ধানের জন্য কান্ট Critique of Judgement (১৭৯০) বইখানা লিখেছিলেন। সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, কিংবা আমরা যেভাবে সৌন্দর্য বুঝি বা অনুধাবন করি, তার ভিত্তি যে সম্পূর্ণত মনোনির্ভর (অর্থাৎ মন্ময় বা subjective) কান্ট তা স্বীকার করেন। তুরীয় অনুধ্যানের সঙ্গে কান্ট-প্রস্তাবিত সৌন্দর্যধারণার সেজন্যেই একটা

মিল আছে। তবে কান্টের এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, সৌন্দর্যের বোধ যত মন্ময়ই হোক — সৌন্দর্যের বিচার পরিমাণে, গুণে, সম্পর্কে ও প্রকারে বিভিন্ন হয়ে থাকে।[৬৩]

কান্ট নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক, নন্দনশাস্ত্রী নন। তিনি নন্দনতত্ত্বের দর্শন নিয়ে ভাবিত ছিলেন। নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক প্রস্থানভূমি জেনে নেবার গরজেই এই আলোকপর্বীয় ভাবুকের উল্লেখ। নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিকতা সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আলোচনা বেশ পাল্টে গেছে, নজরুলের লেখার বিচারে যার উল্লেখ জরুরি। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে ভারতীয় রসশাস্ত্র সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা দরকার। এখানে শুধু এটুকু বলে রাখি, নন্দনতত্ত্বের দর্শন 'Analytic Philosophy'-তে খুব মূল্য অর্জন করতে পারেনি। দার্শনিকেরা তাই বলেন, সৌন্দর্যবিজ্ঞানের কোনো সাধারণ সূত্র নেই এবং থাকা সম্ভব নয়। আমরা একটি ছবির প্রশংসা করি, একটা দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করে; একটা সিম্ফনি শুনে আমরা অভিভূত হই — এসবই সত্য; কিন্তু এ ৩টি অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কোনো ব্যাপার নেই — যা অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে একটা সাধারণসূত্র উপহার দিতে পারে।

এবার ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের কথা। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব ভারতীয় দর্শন ও ব্যাকরণের মতো প্রাচীন নয়। খ্রিস্ট-পরবর্তী সময়ে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ভারতীয় অলঙ্কারবিদ্যায় 'সাহিত্য' শব্দটি এসেছে 'ব্যাকরণ' থেকে, এবং সেক্ষত্রে সাহিত্যের অর্থ নাটক ও কবিতা। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় ব্যাকরণতত্ত্বের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সেজন্য যাকে আমরা 'অলঙ্কারশাস্ত্র' সম্পর্কে জানি, তার বিরাট অংশ কৃত্রিম, অগভীর, যান্ত্রিক। ব্যাকরণবিদ পদের স্বরূপ, অন্বয় ও শৃঙ্খলার বর্ণনা দেন; এবং তারই অনুসরণে আলঙ্কারিকেরা বলেন বাক্য ও পদের মনোহর বিন্যাস ও সৌন্দর্যের কথা। আলঙ্কারিকতা ভারতীয় সাহিত্যচিন্তাকে দীর্ঘকাল শাসন করেছে। অতুলচন্দ্র গুপ্তের[৬৪] (১৮৮৪-১৯৬১) 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র (১৯২৮) অনুসরণে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের নিম্নোক্ত বিবরণ তৈরি করা যেতে পারে।

শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে বাল্মীকি এক ঐতিহাসিক উচ্চারণ করেন, এবং মহাকবি নিজেই তাঁর নাম দেন 'শ্লোক' ঃ কেননা বিপুল বেদনা ও শোকের গর্ভে

সেই 'পাদবদ্ধ বাক্য' 'সমাক্ষর পদ', 'ছন্দোময় শব্দগ্রন্থনে'র জন্ম। বাল্মীকি শিষ্যকে বললেন, 'আমি শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম 'শ্লোক' হোক। রামায়ণে কবিতার উদ্ভবকথা বর্ণিত হয়েছে এভাবে।

আবেগ ও কল্পনার বিশেষ মুহূর্তে প্রতিভাবান মানুষ 'শ্লোকে'র মতো যে 'অপূর্ব মনোহর শব্দগ্রন্থনে'র সৃষ্টি করে, তার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে এদেশে যে আলোচনাশাস্ত্র গড়ে ওঠে প্রাচীন ভারতীয় তাত্ত্বিকেরা তার নাম দিয়েছেন অলংকারশাস্ত্র। মানুষের উচ্চারণ কোন্ বিশেষ গুণে কাব্য হয়, ভারতীয় শাস্ত্রীদের তা ভাবিত করেছে।

কাব্যের স্বরূপবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আলংকারিকেরা বিভিন্ন প্রস্তাব তৈরি করেন। কেউ বলেন, কাব্য তার শব্দ ও অর্থগত অলংকারের জন্য গ্রাহ্যতা লাভ করে। তাঁদের মতে, কাব্য বাক্যনির্ভর; বাক্য-অন্তর্ভূত শব্দরাশিকে অলংকৃত করে (যেমন অনুপ্রাস, অন্বয়, মিল), এবং তার অর্থকে সজ্জিত করে (যেমন উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা) কাব্যের জন্ম হয়। আচার্য বামন বললেন, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' — অলংকারের জন্যই কাব্য মানুষের নিকট গ্রাহ্য হয়েছে। বামনের এ উক্তি সত্য তো নয়ই, প্রাপ্তবয়স্কও নয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বামনের সূত্রেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের নাম হলো 'অলংকারশাস্ত্র'।

আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত (যথাক্রমে নবম ও দশম শতাব্দীর তাত্ত্বিক) কাব্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, তার সঙ্গে বামনের কাব্যধারণার কোনো মিল নেই কাব্যের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এ দুজন তাত্ত্বিক যথাক্রমে ধ্বনি ও রসের ধারণায় উপনীত হন। অলংকার যে কাব্যের উপকরণ মাত্র, এবং অলংকার ছাড়াও যে পৃথিবীতে অসামান্য কাব্য সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা তাঁরা শুরুতেই বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট পদরচনারীতি, বাক্যবিন্যাস, অলংকার — এগুলোর সঙ্গে কাব্যের স্বরূপের কোনো যোগ নেই, এইটে তাঁরা দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন। কাজেই এদের পূর্বেকার কাব্যতত্ত্বকে কাব্যের উপকরণবাদী বিচার বলা যায়.

আনন্দবর্ধনের বক্তব্য হল, কবিতা শব্দ ও শব্দের অর্থনির্ভর হলেও কাব্য কেবল ঐ শব্দ ও তার অর্থের আক্ষরিকতার ওপর বিচার্য নয়। কাব্য বাচ্যার্থের অতিরিক্ত; শ্রেষ্ঠ কবিতা বাচ্য-অর্থকে সবসময় অতিক্রম করে যাবে। শব্দ ও অর্থের বাইরে কাব্যের যে 'ব্যঞ্জনা', তাকেই আনন্দবর্ধন বলেছেন 'ধ্বনি'; এবং তাঁর মতে

অই বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যঞ্জনার ওপরেই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভরশীল। অতুলবাবু লিখেছেন ঃ

> যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেছেন

আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদী, অভিনবগুপ্ত রসবাদী। তবে ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনের সঙ্গে রসবাদী অভিনবগুপ্তের মীমাংসার মিল আছে। ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধন কবিতার বাচ্য-অতীত (শব্দ ও অর্থের অতীত) যে ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন, তা রসেরই ব্যঞ্জনা। রসবাদী অভিনবগুপ্তের বক্তব্য ঃ কবিতার ভেতর ভাবের যে উদ্বোধন, তা কবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কবি ভাবের বিবরণ দেন না, কবিতায় অবলম্বিত ভাব রসের মূর্তিতে চরিতার্থ; এবং এ প্রক্রিয়ায় আচরিত ভাব সংক্রামক বিভাব-অনুভাবে পরিণতি পায়। কাজেই ভাবের তীব্রতা অথবা আবেগের গভীরতার কারণে কোনো রচনা 'কাব্য' হয়না; কাব্য তখনি হয়, যখন ঐ ভাব 'রসে'র মূর্তি পরিগ্রহ করে। রসের আধারে ভাবের পরিণতি কোনো ব্যক্তি, অবস্থা, সময় বা পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — তা সবকিছুর অতীত, এবং 'সকলহৃদয়সংবাদী'। সেজন্যে কবিতায় অবলম্বিত ভাব দুঃখের শোকের বেদনার হলেও তার পরিণাম যে 'রস', তা আনন্দময়। 'রামায়ণ' করুণরসের মহাকাব্য — কিন্তু তা পড়ে আমরা দুঃখিত না হয়ে আনন্দিত হই।

কাজেই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র, কাব্যে অলংকার প্রয়োগের বর্ণনা নয়। বামনের অগভীর কাব্যচিন্তাকে অনেক পেছনে ফেলে চলে গেছে আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তের কাব্যতত্ত্ব। একে অলংকারশাস্ত্র বলা সঙ্গত নয়, এ হলো রসশাস্ত্র; এবং আলোচনার সুবিধার্থে একে ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব বললেও ক্ষতি নেই। তবে ইংরেজিতে যাকে Rhetoric বলে তাকে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। অবশ্য বামন-প্রস্তাবিত 'অলংকারশাস্ত্রে'র 'অলংকার' কথাটির মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে। বামনের অলংকারচিন্তা অনেকটা Rhetoric-ই। Rhetoric বলতে বোঝায় বাগ্মিতার ভাষিক কলাকৌশল। শব্দের পুনরাবৃত্তি, পদ ও বাক্যের বিন্যাস, অভিঘাত সৃষ্টির প্রয়োজনে অভিপ্রেত বাগ্‌সজ্জা— এই হলো Rhetoric; অর্থাৎ বাগ্মিতার অলংকার। এরিস্টটল ও সিসিরো বাগ্মিতার অলংকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় রসশাস্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার, তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, 'নন্দনতত্ত্ব' 'সৌন্দর্যবিজ্ঞান' এসব শব্দ, অনুষঙ্গ ও ধারণার মধ্যে একটা ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা আছে; এ কালের 'সাহিত্যতত্ত্ব' কিন্তু অন্যপথে চলাফেরা করে। সৌন্দর্যের অন্বেষণ ও বোধ, রসতাত্ত্বিক অভিরুচি পাল্টে গেছে এখন। তবু যে ধ্রুপদী নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাগুলো এবং ভারতীয় রসশাস্ত্র সম্পর্কে দু-চার কথা বললাম, তার কারণ হলো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতভাগ স্পষ্ট করা। আরেকটা কারণ হলো, নজরুল ইসলামের শিল্পী জীবনের একটা বিরাট অংশ — যাকে বলতে পারি তাঁর সঙ্গীতপর্ব — ধ্রুপদী নান্দনিকতার প্রতিবেশে বিকশিত হয়। আবারো বলি, নজরুলের গানের আলোচনার অধিকার নেই বলে নজরুলের সেই সাঙ্গীতিক উৎকর্ষের নন্দনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নন্দনতাত্ত্বিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক অভিরুচির পরিবর্তন। 'সাহিত্য' সম্পর্কে ধারণাটাই আজ বদলে গেছে। যে পরিমাণে প্রাক্তন সাহিত্যের পুনর্বিচার হয়েছে, সে অনুপাতে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। এতে দুঃখ পাবার দরকার নেই, কেননা সাহিত্যের ব্যাখ্যাকে এখন সাহিত্যই মনে করা হয়। এসব নতুন সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োজন কি আমাদের, একথা উঠলে বলবো ঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় 'সাহিত্য'কে যেরকম সঙ্গতভাবে বড়ো পরিসরের ব্যাপার মনে করা হত, কালক্রমে বাঙালি কবিরা তাকে অনেক সংকুচিত ও সংকীর্ণ করে ফেলেন। এতে সুবিধে হয়েছিল এই যে, 'আধুনিক কবিতা' নামক একটা বিশিষ্ট সাহিত্যধারা অল্প দশকের ব্যবধানে গড়ে ওঠে; কিন্তু অসুবিধা এই যে, 'আধুনিকতা' নামক ধারণা ছাড়া সাহিত্যের বিচার যে হতে পারে, তা আমরা ভুলে গেলাম। অসুবিধে এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যান যে 'আধুনিক' দৃষ্টিতে পাঠ করা করা যেতে পারে, তা আমাদের আর বিশ্বাস করানো গেলোনা। রবীন্দ্র-পরবর্তী 'অতি-আধুনিক' কবিতা সম্পর্কে আমাদের কোনো অশ্রদ্ধা নেই, এটা এর মধ্যে একবার জানিয়ে রাখা ভাল। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতায় মোহগ্রস্ত হয়ে আমরা জগতের উত্তরকালীন বুদ্ধি-চিন্তা-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্যবোধের সঙ্গে কোনো পরিচয়ই রাখলাম না, এর মধ্যে কি কোনো 'আধুনিকতা' আছে? 'আধুনিক সাহিত্য' বলে আমরা যা বুঝি, তা অভিজ্ঞতার মাপে এতো ছোট এতো সংকীর্ণ এতো সংকুচিত যে তাকে আর প্রাপ্তবয়স্ক মনে হয় না।

ভারতীয় শাস্ত্রীরা বলেছেন, কাব্য হবে 'সহৃদয়সংবাদী'। অর্থাৎ তাঁরা কবির সঙ্গে পাঠকের যোগের কথা ভেবেছেন, এবং বলতে চেয়েছেন, আক্রান্ত করার ক্ষমতা ছাড়া কবিতার মূল্য সামান্য। রসের উদগমের কথা এজন্যেই এত বড় করে তাঁদের তত্ত্বে এসেছে। 'রস' হলো একটি 'সামান্য ধারণা'; মহৎকাব্য পড়ে রসবোধ জাগে, অর্থাৎ আমরা আনন্দিত হই। 'রস' আর 'আনন্দ' এক জিনিশ কিনা, সেও এক সূক্ষ্ম তর্ক। তবে 'রস' নামক 'সামান্য ধারণা', এবং কাব্যোপলব্ধির সাধারণ সূত্র রচনা করে শাস্ত্রীরা আমাদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শাস্ত্রীদের রসের ধারণায় যথেষ্ট বস্তুভিত্তি আছে, এবং নর-নারীর প্রেম ও মিলনের সঙ্গে এর যোগ ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাবের সহযোগে রসের উদ্বোধন ঘটে, এবং কবির কর্তব্য বিভাগগুলোর সংযোগ সাধন। প্রেমের মধ্যে দিয়ে মিলনের যে পরিস্থিতি বিভিন্ন বিভাব-সহযোগে উদ্দীপিত হয় এবং অবশেষে মিলনের আনন্দে তার পরিণতি ঘটে, এই গোটা প্রক্রিয়াটাকেই ভিন্নভাবে শাস্ত্রীরা কবিতা ও তার পাঠকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এভাবেই তাঁদের সৌন্দর্যতত্ত্বের বস্তুভিত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। মহৎ কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতাকে তাঁরা 'লোকোত্তর আনন্দ' বলেন, এবং আমরা জানি, হিন্দু দর্শনে নর-নারীর মিলনের চূড়ান্ত আনন্দ-মুহূর্তটিকে লোকোত্তর তথা ঐশ্বরিক মনে করা হয়।

সাহিত্যতত্ত্ব বলতে এখন সেই সনাতন রসশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বোঝায় না। সাহিত্য যে আনন্দের জন্ম দেয়, এ কথাও এখন কেউ বলেন না আর। সাহিত্যকে এখন মনে করা হয় 'ভাষানির্ভর কাজ' যার মধ্যে কেবল আনন্দ নয়, বরং আরো অনেক জটিল ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ব্যাপার আছে। একসময় বলা হয়েছিল, আধুনিক কবিতার প্রধান বিষয় আধুনিক চৈতন্য, একসময় বলা হলো কবিতার কাজ প্রতিমার সৃষ্টি, একসময় বলা হলো কবিতা মূলত শব্দের ব্যাপার। এককথায় নতুন চৈতন্যের আধার হবে আধুনিক কবিতা, যার অবলম্বন শব্দ। একসময় বলা হলো, কবিতা হবে অলংকারহীন, নিরাভরণ — কিন্তু জটিল সৌন্দর্যের দ্রষ্টা। ত্রিশোত্তর কাল থেকে কবিতার বিচার কিংবা কবিতা সম্পর্কিত ধারণা এভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

কিন্তু আমরা যে সাহিত্যতত্ত্বের কথা বলছি, তা এক ভয়ানক বিপর্যয়ের কথা বলে। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সর্বজনীন আনন্দের জন্ম হয় কিংবা

রসোপলব্ধি ঘটে, এসব আজকের দিনে আর আলোচ্য নয়। এখনকার সাহিত্যতত্ত্ব হলো, টেক্স্টে বিধৃত ভাষার স্বভাব পরীক্ষা করা।[৬৫] অবশ্য ভাষা সম্পর্কে এতোকাল আমরা যা ভাবতাম, তারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

বহুকাল ধরে 'ভাষা' ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিশ, অর্থাৎ বাহক মাত্র। বার্তা, বক্তব্য, মানুষের চিন্তার বাহক। আধুনিক সাহিত্যে 'চৈতন্য'কে খুব মূল্যবান মনে করা হয়েছে, কিন্তু ' চৈতন্য'ও তো প্রকাশিত হয় ভাষার আনুকূল্যে। একসময় দর্শনের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল 'সত্তা' নিয়ে; 'সত্তা' নিয়ে হাইডেগার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই হাইডেগারই উত্তরকালে তাঁর চিন্তা ফিরিয়ে আনেন ভাষার বিশ্লেষণে। ভাষার বিশ্লেষণ মানে 'ভাষাতত্ত্ব' নয় — ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তো সোসুর থেকেই শুরু; মার্টিন হাইডেগার ভেবেছেন ভাষার দর্শন ও স্বভাব নিয়ে। হাইডেগারের আলোকপাত থেকে এবং সে সূত্রে উত্তর-গ্রন্থনবাদী বিশ্লেষণধারা থেকে আমরা বুঝি, 'ভাষা' আর যাই হোক 'বাহক' নয়, 'মাধ্যম' নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু নয়। আমরা যখন চিন্তা করি, তখন ভাষার মাধ্যমেই করি; অর্থাৎ ভাষা ছাড়া চিন্তার অস্তিত্বই প্রমাণ করা অসম্ভব। আমাদের চিন্তা ও চৈতন্য যদি ভাষার আধারেই বিন্যস্ত থাকে, তাহলে ভাষাকে যে এতদিন গৌণ মনে করা হয়েছে, সেই চিন্তার মধ্যে নিশ্চিত একটা গলদ আছে। উত্তর-গ্রন্থনবাদী ভাবুকতা শুধু ঐ চিন্তার গলদ ধরিয়ে দেয়নি, বরং 'ভাষাকে' স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ধারার চিন্তার গুরুত্ব এইখানে যে, 'ভাষা'র চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু যদি থেকে থাকে (চৈতন্য, সত্তা, মন) তাহলে 'ভাষার' সংজ্ঞা 'ভাষা' ছাড়া দেয়া সম্ভব হয়না কেন? ভাষার সংজ্ঞা কি ভাষার রিফ্লেকসিভিটির সমস্যা তুলে ধরেনা? ভাষার সংজ্ঞা কি ভাষা ছাড়া দেয়া সম্ভব? 'ভাষা'র সংজ্ঞা কি এই নয় যে, 'ভাষা' হলো 'ভাষা'! মার্টিন হাইডেগার অন্তত এর চেয়ে ভালো সংজ্ঞা 'ভাষা'র জন্যে খুঁজে পাননি। হাইডেগারের[৬৬] মতে, 'ভাষা' হলো ভাষা, এবং এটাই ভাষার আদর্শ সংজ্ঞা। কারণ 'ভাষা' এমন জিনিশ যার চরিত্র নিষ্ঠুরভাবে রিফ্লেকসিভ। যে কোনো বক্তব্যই কিংবা ভাষা সম্পর্কে যে-কোনো বক্তব্যই 'ভাষা'র আধারে ব্যক্ত হতে বাধ্য, ভাষা বাদ দিয়ে ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এদিক থেকে ভাষা অত্যন্ত স্বাধীন, স্বাবলম্ব এবং মানুষের সকল দর্শন, ভাবনা ও বিদ্যার নিয়ন্ত্রক। হাইডেগার বললেন, মানুষ তো কথা বলেনা, কথা বলে 'ভাষা'। ভাষা বিষয়ে এই কথা বলে হাইডেগার ভাষা সম্পর্কিত

অতীতের সকল ভাবনার বিরোধিতা করেন। 'ভাষা' কোনো উপকরণ নয়, 'ভাষা' হলো 'সম্ভাবনা' ঃ ভাষা কোনো কিছুর মাধ্যম নয়, বাহক নয়, দাস নয়, 'ভাষা' এক অন্তহীন সম্ভাবনার নাম। হাইডেগার ভাষাকে 'চিন্তা' বা 'যোগাযোগের' উপকরণরূপে সীমিত করে ফেলতে নারাজ। তাঁর মত হল ঃ 'ভাষা' কথা বলে এবং বক্তব্য প্রদান করে; ভাষা অর্থ বহন করেনা, অর্থ সৃষ্টি করে এবং অর্থ বদলে দেয়; এবং ভাষা হলো ভাষা; সবকিছু ভাষার মধ্যে অন্তরিত এবং ভাষার মধ্যে ব্যক্ত। হাইডেগার এভাবে ভাষাকে মানব সামর্থ্যের এক শক্তিমান রহস্যময় প্রতিপক্ষ করে তুলেছেন। প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন মনে করেন, ভাষাকেন্দ্রিক নব্যচিন্তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্রীদের চিন্তার যোগ আছে। ভাষা যদি হয় চিহ্নমালার ব্যবস্থা, কিংবা ভাষা বলতে যদি আমরা ধ্বনি কিংবা ধ্বনির প্রতীক বুঝি, তাহলে ঐ ধ্বনি, চিহ্ন বা প্রতীকের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্ক 'অনিত্য' হতে বাধ্য। সাউণ্ড এবং সেন্সের (ধ্বনি ও অর্থ) সম্পর্ক যে নিত্য হতে পারে না, তার সংকেত রসশাস্ত্রীদের লেখায় আছে, এবং সেজন্যেই তাঁরা 'বাচ্যার্থ' এবং 'ব্যঙ্গার্থ' নামক দুটো ক্যাটেগরি তৈরি করেছেন। সাহিত্যের লক্ষ্য যদি কেবল 'বাচ্যার্থ' না হয়, ব্যঙ্গার্থেই যদি হয় সাহিত্যের চরিতার্থতা, তাহলে জাক দেরিদার টেকস্ট-ধারণার সঙ্গে — অর্থাৎ টেকস্ট হলো দ্যোতক-দ্যোতিতের অনন্তরঙ্গের মঞ্চ — এদেশের প্রাচীন রসতাত্ত্বিক চিন্তার যোগসূত্র নির্ণয় অসম্ভব হবার কোনো কারণ নেই।

মানুষের লেখা এবং লেখার ভাষা এক অস্থিরতা ও অনির্দিষ্টতার মধ্যে সঞ্চরণশীল, তাই ভাষা-ব্যাখ্যাকে দেরিদা 'লোগোসেন্ট্রিজম' থেকে মুক্ত করতে চান। দেরিদার কথা হলো, ভাষা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভাষার বাইরে কিছু নেই; আর ভাষার অর্থ পরিবর্তনশীল, কেননা টেকস্টের কোনো রিপ্রেজেন্টেশনই নির্দিষ্ট কোনো অর্থের কাছে দাসখত লিখে দেয়না। অর্থের এমন কোনো অবশেষ খুঁজতে যাওয়া উচিত নয়, যাকে চৈতন্যে ধারণ করে ধ্যান করা যাবে। দেরিদা পশ্চিমের দর্শনকে বিবেচনা করেন প্রাক্-গৃহীত ধারণা ও সংস্কারের পুনরাবৃত্তিপূর্ণ সম্প্রসারণ হিশেবে, এই প্রাক্-গৃহীত ধারণাকে দেরিদা 'মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স' বলেন। 'মেটাফিজিকস অফ প্রেজেন্স' বা উপস্থিতির পরাতত্ত্ব মানে জগত, সংসার, জীবন ও টেকস্ট-কে আগে-থেকে-ধরে-নেওয়া ধারণার ভিত্তিতে চিন্তা ও বিচার করা। পশ্চিমের দর্শন এই পরাতত্ত্বের শাসনে পরাধীন ছিলো দীর্ঘকাল। প্রশ্ন হলো, টেকস্ট যদি হয় 'কনস্ট্রাকশন' তাহলে তার ডিকনস্ট্রাকশন' কেন? দেরিদার মতে,

তা এজন্যে যে, 'রিপ্রেজেন্টেশন বলে যে-বস্তুর কথা আমরা শুনে আসছি, সেটা এক অ-সম্পূর্ণ মানবিক উদ্যম — কেননা কোনো রিপ্রেজেন্টেশনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এবং হবার দরকারও নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে অর্থের সেই 'গ্রাণ্ড অথরিটি' নষ্ট হয়ে গেছে। ডিকনস্ট্রাকশন কোনো ভালো অর্থ সরবরাহের গ্যারান্টি দেয়না। 'জ্ঞান' 'ইতিহাস' ' চৈতন্য'— এগুলো মেটাফিকাল দর্শনের বিভিন্ন দরোজা জানালা, দেরিদা এসবের বাইরে অবস্থান করতে চান। হিউম্যানিজমের সমালোচনা করে সেজন্যে তিনি লেখেন 'দি এনডস্ অফ ম্যান' পরাতত্ত্বের বিনাশ ও দর্শনের মৃত্যুর পটভূমিকায় দেরিদার বিনির্মাণবাদী শোভাযাত্রা চিত্তাকর্ষক।

সাবজেকটিভিটির নির্মূলন চান জাক দেরিদা এবং তাঁর শিক্ষক মিশেল ফুকো। 'সাবজেকটিভিটি' কি? এ হলো মনোগত বিষয়, বা মনের মধ্যে ধরে নেয়া বিষয়। এ সাবজেকটিভিটি চৈতন্যের আকারে দেখা দিতে পারে, মানবতাবাদের চেহারা নিতে পারে; এ হতে পারে একটা প্রগতিবাদী বিশ্বাস, হতে পারে ইতিহাসকেন্দ্রিক প্রগতিবাদী ধারণা। 'জ্ঞান' বস্তুটাকে দেরিদা খুব সন্দেহ করেন। কেননা জ্ঞানের ভেতর ইমানুয়েল কান্টের মতো অতোটা আলো, ওরকম চেতন্য, অমন প্রগতি তিনি দেখেন না। নতুন জ্ঞান উপহার দেবার বদলে দেরিদার কাম্য জ্ঞানের একটি ভিন্ন আকরণ উপস্থিত করা। মানুষ ও চেতনা ও তার ইতিহাস প্রগতির দিকে ধাবমান, এরকম কথা দেরিদাকে বিশ্বাস করানো যায়নি।

এডমান্ড হুর্সেল (১৭৫৯-১৮৩৮) এবং মার্লো-পোন্তির ফেনমেনলজির অধিবিচার করেন দেরিদা। উপরোক্ত দু'জন দার্শনিক বলতে চেয়েছেন মানুষের পক্ষে আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির পরিপূর্ণ মুহূর্ত অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু দেরিদার মতে এ ধারণা আসলে সত্তার গভীর খুঁড়ে অর্থতালাশের সামিল। পাশ্চিমের দার্শনিক ঐতিহ্যের এ এক অতিপুরনো ফ্যাশন। পশ্চিমের দার্শনিক অনুসন্ধান এভাবে অর্থ ও তাৎপর্যের অনেকগুলো কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে রেখেছে, যাকে দেরিদা নাম দেন 'সিস্টেমস অফ মেটাফিজিকস্ বা পরাতাত্ত্বিক ব্যবস্থা। অর্থের এক স্থায়ী ও অপরিবর্তিত উৎস দেখানো এবং বিশ্বাস করানো এর লক্ষ্য। ইংরেজিতে এরকম অনেক 'ভ্যালুড টার্মস' আছে — যেমন ঈশ্বর, যুক্তি, সত্য। এসব টার্মসের নেপথ্যে কার্যকর সত্যের উৎস বিষয়ে একটা স্থায়ী বিশ্বাস। এ ধরনের বিশ্বাসকে দেরিদা

'লোগোসেন্ট্রিক' বলেন। দেরিদার সোজা প্রশ্ন — এসব টার্মসকে কি এসব টার্মস দিয়ে বোঝা যায়? এসব টার্মসকে বুঝবার জন্যে কি এদের বিপরীত টার্মস ধার করতে হয়না? কারণ ঈশ্বর কি তা বুঝতে হলে আমাদের বলতে হয় "ঈশ্বর সে যে শয়তান নয়', কিংবা 'সত্য তাই, যা মিথ্যা নয়'। ঈশ্বরের আর সত্যের মধ্যে এর চেয়ে বেশি কিছু দেরিদা দেখেন না। দুটো টার্মস ছাড়া এগুলোর মধ্যে আর কোনো তাৎপর্য যদি থাকে, তাহলে বলতেই হবে সে তাৎপর্য টার্মসের মধ্যে নেই — সত্তার গভীর খুঁড়ে মনের মতো বার করা হয়েছে অর্থ ও তাৎপর্যকে সাইনগুলোর বাইরে থেকে ধার করে আনার স্বভাবকেই দেরিদা পাশ্চাত্য দর্শনের লোগোসেন্ট্রিক ঝোক বলেছেন।

এসব প্রসঙ্গ তুলছি একারণে যে, যে-নজরুল ইসলামকে আমরা উত্তর-ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরতে চাইছি, এবং ত্রিশোত্তর কবিতার 'আধুনিকতা'-তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করতে চাইছি, তার একটা ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। নজরুল ইসলামকে 'বিদ্রোহী' বললে, তার কবিতাকে বিদ্রোহের কবিতা বললে, আসলে কিছুই বলা হয়না। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামো ও প্রশাসন-শৃঙ্খলার বিপরীতে নজরুল ইসলাম ভিন্ন নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ভাষা বাছাই করেছেন কবিতায়; ভারতীয় ও পশ্চিমএশীয় পুরাণ-মিথলজিকে বিদ্রোহী করে তুলেছেন, কবিতার সনাতন বাগবিধিকে অগ্রাহ্য করেছেন ঃ এগুলোর যে একটা গুরুত্ব আছে এবং সেই গুরুত্ব যে বর্তমান উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য সংস্কৃতির-জিজ্ঞাসায় বুঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই বোধটা ধরিয়ে দেয়ার জন্যেই এসব প্রসঙ্গ তুলছি। আমাদের বয়ানে নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতি অল্প এজন্যে যে, নজরুলের বিখ্যাত উদ্ধৃতিগুলো মোটের ওপর সকল সাহিত্যপিপাসুরই জানা। তাছাড়া সমালোচকেরা বিভিন্ন বইপত্রে বাছাই করে করে সে সব পংক্তি ও চরণ এত ব্যবহার করেছেন যে, তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য। নজরুলের টেক্স্ট পাঠ করার একটা ভিন্ন প্রবেশপথ তৈরি করা, যাকে ইংরেজিতে বলে 'রিডিং', আমার একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্যেই দেরিদা-হাইডেগারের প্রসঙ্গ তুলেছি, কেননা বর্তমান দর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বে মূল প্রশ্নগুলো কোথায় কেন উঠেছে, তা খেয়াল করা দরকার। উপরন্তু যেহেতু পোস্টমডার্নিজমের জিজ্ঞাসাগুলোর সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক তদন্তমালার একটা যোগসূত্র আছে, সেজন্যে প্রথমে পোস্টমডার্নিজমের উল্লেখ করতে চাই।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যবিশ্লেষণ ও সমকালীন সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার বিভিন্ন অভিঘাত ও তরঙ্গ আমাদের দেশেও এসে পড়ছে গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে। পোস্টমডার্নিজম ও পোস্ট কলোনাইজেশন — শব্দ দুটো এখন নিত্য শোনা যায়। দুটো শব্দেরই প্রথমে 'পোস্ট' কথাটি থাকায় এমন তো মনে হতেই পারে যে, এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর। কৌতূহলের বিষয় এই যে, দুই বিষয়ের তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য, লক্ষ্য ও গন্তব্য পৃথক হলেও সম্পর্ক আছে, এই সম্পর্ক তথা সংশয়ের ইঙ্গিত থেকে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদের স্বভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতির চেহারায় অনেক বদল ঘটেছে। পোস্টমডার্নিজম ও পোস্টকলোনিয়ালিজম হল সেই পরিবর্তনকে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বুঝবার চেষ্টা।

১৯৬১ সালে তরুণ ফরাশি দার্শনিক মিশেল ফুকো উন্মাদনার ইতিহাসের ওপর একখানা বই লেখার পর বিশাল একাডেমিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অনেকে এ বইতে বিভিন্ন অসংগতি খুঁজে পান, কেউ রোমান্টিকতার দোষ বইয়ের নানাস্থানে লক্ষ করেন, কেউ বলেন এতে ঐতিহাসিক সময়কে গ্রাহ্য করা হয়নি। এসব কথার পরেও মিশেল ফুকোর বইয়ের যথার্থ ও উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হয়নি। বইটি বার হবার দু'বছর পর জাক দেরিদা এবই সম্পর্কে একটা মৌখিক বক্তৃতা (পরে লিখিত) দেওয়ার পর বিতর্ক বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষতায় মোড়া নেয়। আসলে ফুকো এবং দেরিদার মধ্যে 'উন্মাদনা' নিয়ে বিতর্ক হয়নি, তারা বিতর্ক করেছেন পাশ্চাত্য দর্শনের কিংবদন্তীপ্রতিম পুরুষ রেনে দেকার্ত সম্পর্কে। তাঁদের ঝগড়ার কেন্দ্র ছিলো পাশ্চাত্য চিন্তার স্বভাব নিয়ে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, যে-পথ ও পদ্ধতিতে পশ্চিমের লোকেরা যুগের পর যুগ চিন্তা করেছে তা বদলে দেয়া সম্ভবপর কিনা? দেরিদা বলেন, ডিকনস্ট্রাক্শন অর্থ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো রেফারেন্স স্বীকার করে না; তার মানে হল, ভাষার চিহ্ন ভাষা দিয়েই বুঝতে হবে, এর সঙ্গে কোনো অ-ভাষিক বাস্তবতা (নন-লিংগুইস্টিক রিয়ালিটি) জড়ানো যাবে না। জাক দেরিদা এভাবে চিহ্নের ব্যক্তিত্ব প্রসারিত করে দেন, চিহ্ন হয়ে ওঠে সক্ষম এক ভাষাবস্তু। তাই অর্থের উদ্ভাবন ও তাৎপর্য নিয়ে যে গৌরববোধ এতোকাল ধরে চলে আসছিল, দেরিদা তাকে ম্লান করে দেন। শব্দের ওপর বিষয়ের প্রাধান্য লংঘন করে যান দেরিদা।

জাক দেরিদা সম্প্রতি ঝড় তুলেছেন কাল মার্কস বিষয়ে একখানা বই লিখে। দেরিদা বলেছেন, মার্কসের লেখা পড়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গেছেন; একথার সূত্রে কারো কারো মনে এমন অনুসন্ধিৎসাও জেগেছে, যে দেরিদার 'গ্রাম্মাটোলজি'তে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও থাকতে পারে। দেরিদা বলেছেন, তিনি কখনো এন্টি-মার্কসিস্ট ছিলেন না। তাঁর ডিকনস্ট্রাকশন মোটেও মার্কস-বিরোধী নয়, এমন কথা জোর দিয়েই বলেছেন তিনি।

এক আলজিরিয় ইহুদী পরিবারের সন্তান জাক দেরিদা। আলজেরিয়াতে ১৯৩০ সালে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সে আসেন তিনি। প্যারিসের ইকোলে নরমাল সুপিরিয়রে লেখাপড়া করেন দেরিদা, তবে ১৯৬৫ সালেই দুটো রিভিয়্যু-প্রবন্ধ লিখে তিনি সাড়া তোলেন সর্বত্র। রিভিয়্যু-প্রবন্ধ দুটো আয়তনে বেশ বড় ছিল, আর আলোচনার বিষয় ছিল ঃ ইতিহাস এবং লেখার স্বভাব। প্যারিসের 'ক্রীটিক' জার্নালে লেখা দুটো ছাপা হলে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগে। দেরিদার বিখ্যাত 'অফ গ্রাম্মাটোলজি' বইয়ের ভিত্তি এই রিভিয়্যুগুলো।

শুরু থেকেই দেরিদার দার্শনিক রচনায় একটা ভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানী প্রবণতা ছিল, এবং পশ্চিমের দর্শনের ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর ভাবনা ছিল অত্যন্ত নতুন। পশ্চিমের দর্শনের চিন্তায় 'লজিক অফ আইডেনটিটি'র ওপর নির্ভরতাকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। লজিক অফ আইডেনটিটির উৎস এরিস্টটল, আর বার্ট্রান্ড রাসেল এর ৩টি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন[৬৭] এভাবে ঃ

এক ঃ The law of indentily : 'Whatever is, is.'

দুই ঃ The law of contradiction: 'Nothing can both be and not be

তিন ঃ The law of the excluded middle: Everything must either be or not be'. [৬৯]

চিন্তার এই আইন এবং অনুশাসনগুলো শুধু যে যুক্তিশীল সঙ্গতির জয়ধ্বনি করে তাই নয়, একইসঙ্গে ধরে নেয় — আবশ্যকভাবে — একটা essential realityকে একটা 'অরিজিন'কে ঃ সেই অরিজিন, সেই অনিবার্য বাস্তবতার দিকে এই অনুশাসনগুলো ইঙ্গিত করে যায় সব সময়। এই 'যুক্তিশীল সঙ্গতি'কে অতিরিক্ত মেনে চলার কারণে এই 'অরিজিন' সবসময় 'সাধারণ' হয়ে ওঠে অর্থাৎ কোনো অসংগতি, সংঘাত ও দ্বন্দ্বকে অনুমোদন করেনা। দ্বন্দ্বমুক্ত অরিজিন' শুধু

সাধারণই হয় না, এর অন্তঃসারও ব্যতিক্রমহীনভাবে অভিন্ন হয়ে থাকে, শৃংখলাও এর মধ্যে একরকম। চিন্তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত করে ফেলার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে দর্শনের এই ঐতিহ্য: অর্থাৎ সকল জটিলতা, ভিন্নতা, পৃথকতার পরপারে নিয়ে যেতে চায় এই চিন্তার ধরন। চিন্তার মধ্যে যদি দেখা দেয় কোনো ভিন্নতা, পার্থক্য ও জটিলতা, তাহলে তাকে 'অশুদ্ধ' মনে করার একটা বাতিক পশ্চিমের দর্শনে লক্ষ করেন জাক দেরিদা। ফলে পশ্চিমের দর্শন সবসময় বিপরীত যুগ্মতার সরল ভাগ মেনে মেনে চলে — যেমন আদর্শ/বাস্তব, আভ্যন্তর/বহিরিস্থিত, প্রকৃতি/সংস্কৃতি, ঈশ্বর/ শয়তান, সক্রিয়তা/অক্রিয়তা, সত্য মিথ্যা। দেরিদার মতে, ঠিক এইভাবে পশ্চিমের দর্শনের চিন্তা বিভিন্ন শতাব্দীতে গড়ে ওঠে। 'ডিকনশস্ট্রাকশন' নামক চিন্তার এক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে দেরিদা পশ্চিমের অধিবিদ্যার ধারার মৌলিক তদন্ত উপস্থিত করেন। দেরিদার নিজের লেখা পশ্চিমের এই ঐতিহ্যকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে, এবং হাজির করে ধাঁধা, কূটাভাস, রঙ্গ। দর্শনের সমালোচনা নয় শুধু, বরং দর্শনের স্বভাবকে পাল্টে দেওয়া তাঁর গোপন লক্ষ্য; দর্শনকে সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনের মধ্যে তিনি নিয়ে যেতে চান। দর্শনের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার অঙ্কুরোদ্গম ঘটানো তাঁর উদ্দেশ্য।

দেরিদার দর্শন ও চিন্তায় কূটাভাস থাকার কথা আমরা বলেছি। উদাহরণ হিশেবে তাঁর রুশো পাঠের কথা বলতে পারি। রুশো বলেন, প্রকৃতির একটা আত্মসম্পূর্ণ কণ্ঠ আছে, যা এককভাবে আমাদের শ্রবণ করা উচিত। রুশোর মত হলো, প্রকৃতি নিজের মধ্যে নিজে একাত্ম; প্রকৃতির কোনো বিকল্প নেই এবং প্রকৃতির সঙ্গে আর কিছু যুক্ত হবেনা। কিন্তু সেই রুশোই একটু পর গিয়ে বলেন, প্রকৃতিতে কখনো কখনো কোনো কিছুর অভাবও থাকে — যেমন এমন মা থাকতে পারে যাঁর স্তনে তাঁর শিশুর জন্যে দুগ্ধ নেই, উপযুক্ত পরিমাণে নেই। অভাব বা শূন্যতা প্রকৃতির একমাত্র অলংঘনীয় অনিবার্য বৈশিষ্ট্য না হলেও, অভাব এবং শূন্যতা কিছু আছে। দেরিদা বলেন, রুশো যে 'সম্পূর্ণ-স্বাবলম্ব প্রকৃতি'র মিথ তৈরী করেন, দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে এমন সম্পূর্ণতা-স্বনির্ভরতা নেই। এরপরে দেরিদা বলেন, যদি প্রকৃতিকে আমরা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' ধরতে চাই তাহলে তার অভাব এবং শূন্যতাকে মেনে নিতে হবে। কাজেই অভাব এবং অপূর্ণতাকে যুক্ত না করলে প্রকৃতি সম্পর্কিত আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হতে পারে না। কিন্তু যদি অপূর্ণতা প্রকৃতির অংশ হয় তাহলে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলার দরকার নেই। কেননা স্বনির্ভরতা ও

অপূর্ণতা পরস্পরের বিপরীত। প্রকৃতির আইডেনটিটির চিহ্নিত করতে হলে, এর কোনো একটিকে (সম্পূর্ণতা অথবা অপূর্ণতা) তার ভিত্তি বলে মানতে হবে। অন্যদিকে সংঘাত এড়ানোর জন্যে দুটোকে আইডেনটিটির গণ্য করা সম্ভব নয়। যদি তাই হয়, দেরিদা বলেন, তাহলে প্রকৃতির আইডেনটিটি কি? এরকম বস্তু আসলে আছে কিনা? বস্তুটি থাকার আদৌ দরকার আছে কিনা? তাহলে এটাই কি আমরা দেখিনা যে, যেসব জিনিসকে বিশুদ্ধ আইডেনটিটি মনে করা হয়, তা আসলে বিশুদ্ধ নয়? তার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, তা প্রায়ই অমীমাংসিত, সর্বোপরি এই-ই কি আমরা বুঝিনা যে, আসলে আইডেনটিটি বলতে কিছু নেই! যদি এমনই হয় তাহলে রুশো কি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতির কথা বলেন? তার selfpresence এর কথা বলেন? তার বিশুদ্ধতার কথা বলেন! প্রত্যেক সাধারণ অরিজিনই কি নন-অরিজিন নয়? বিশুদ্ধ অরিজিন এবং বিশুদ্ধ আইডেনটিটি, নিজেই কি একটা মিথ নয়? ভাষার দর্শন আর চৈতন্যের মধ্যস্থতা ছাড়া যদি এ জগত কিংবা নিজেকে বোঝা না যায়, তাহলে বিশুদ্ধ অরিজিন থাকে কি করে? আইডেনটিটিরও বা কি মানে হয়? চৈতন্য আর ভাষার দর্শন ছাড়া এ পৃথিবীকে আমরা বুঝিনা, নিজেদেরও আমরা বুঝিনা। তবে, দেরিদার মতে, চৈতন্য আর ভাষার কাঁচ জ্ঞানকে সম্ভবপর করে তুললেও এ দুটো কিন্তু জ্ঞান প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তারা কি প্রকৃতি নামক — রুশো কথিত আত্মএকাত্ম উপস্থিতির বিকল্প হয়ে উঠে না?

বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রথম যিনি ভাষার বিশ্লেষণ করেন, তার নাম ফার্দিনান্দ দ্য সোসুর, ১৯৬৮ সালে দেরিদা তাঁর Defferance ধারণার বিকাশ ঘটান সোসুরের ভাষা জিজ্ঞাসার অবলম্বনে। সোসুরও বুঝেছিলেন, ভাষা শুধু চিহ্নমালার সিস্টেম নয়, পার্থক্যেরও ব্যবস্থা। দেরিদার মতে, ভাষার ভেতর এই পার্থক্যকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিতে সোসুর এবং তাঁর পরবর্তী গ্রন্থনবাদীদের কষ্ট হয়েছিল খুব। দেরিদা বলেন, পশ্চিমের মেটাফিজিকাল চিন্তার বাইরে যা থেকে যায়, তার প্রত্ন-প্রতিমা (proto-type) এই 'ডিফারেন্স', এই পার্থক্য। সোসুর এই ডিফারেন্সকে ইতিবাচক মনে করেননি, দেরিদাই একে একটা প্রপঞ্চমূলক রূপে নিয়ে আসেন, এবং তখন তা আর সোসুরের মতো অধরা অগম্য থাকেনা। সোসুরের ভাষা-চিন্তার একটা ব্যাপার দেরিদা একেবারেই মেনে নেননি। সোসুর 'লেখা'র তুলনায় 'কথা' কে গুরুত্ব দেন, তাঁর মতে ভাষা-সম্প্রদায়ের লোকেরা যে

কথা বলে, তা লেখার চেয়ে বেশি মূল্যবান — অর্থাৎ লেখা নয়, কথাই ভাষার আসল রূপ। লেখার ভাষার মধ্যে ভাষা মরে যায়, ভাষা তখন আর জীবন্ত থাকেনা, লেখা তখন হয়ে ওঠে ভাষার রূপের একটা বিকৃতি। লেখার ভাষায় ব্যাকরণের নির্দেশ মান্য করা হয়, তখন ভাষার মূল স্বভাব — যাকে আমরা পরিবর্তন বলে জানি — নষ্ট হয়ে যায়। বিপরীতে মুখের ভাষা কখনোই স্থির নয়, লেখার ভাষার মতো নিশ্চল নয়, মুখের ভাষা সবসময় পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। দেরিদা দেখেছেন, সোসুর, অপরাপর গ্রন্থনবাদী, লেভি-স্ত্রোস এঁরা সকলে 'লেখার এক কথ্য প্রবণতা-'র পক্ষপাতী। সেজন্যে লেখাকে তাঁরা মুখের কথার তুলনায় দ্বিতীয় পংক্তিভুক্ত মনে করেছেন, লেখাকে মনে করেছেন 'বিশুদ্ধভাবে গ্রাফিক' একটা ব্যাপার। বড় জোর ভেবেছেন, লেখা হয়ত বা স্মৃতিরই সহযোগী বা সাহায্যকারী; অথবা ভেবেছেন, লেখা ধ্বনি-সমাবেশের বেশি কিছু নয়; 'লেখা' বড় জোর ভাষার ধ্বনির উপস্থাপক। কেন এমন ভাবলেন এঁরা তার কারণ উদঘাটন করেছেন জাক দেরিদা। তিনি বলেন, সোসুর এবং অন্যান্য গ্রন্থনবাদীরা পশ্চিমের অধিবিদ্যার ধারায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত; সেজন্যে লেখার চেয়ে মুখের কথা জরুরি তাঁদের কাছে — কেননা, তাঁরা মনে করেন মুখের ভাষা চিন্তা, আবেগ, বক্তার উদ্দেশ্যের অনেক নিকটবর্তী। Speech কে সেজন্যে তাঁরা খাঁটি বলে জানেন। আর লেখার মধ্যে তাঁরা দেখেছেন উপস্থাপনমূলকতা। মুখের ভাষার একটা বিশোধিত রূপান্তরিত উপস্থাপিত প্রকরণ তাঁরা লেখার মধ্যে লক্ষ করেন। বৈজ্ঞানিক মুখচ্ছদের আড়ালে সোসুরের ভাষা-চিন্তার মেটাফিজিক্যাল চরিত্র উদঘাটন করে দেখান জাক দেরিদা। দেরিদাকে বলা হয় 'গ্রাম্মাটোলজিস্ট' অর্থাৎ লেখার তাত্ত্বিক'। সর্বত্র তিনি লেখার স্বভাব ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং এভাবে দর্শনের ও ভাবুকতার সৃষ্টিশীলতা বাঙ্ময় হয়েছে তাঁর রচনায়। Of Grammatologহ বইতে একটি পরিচ্ছেদ আছে The End of the Book and the Beginning of Writing; তাঁর মতে যা রচিত হয় তাই লেখা নয়, লেখা হলো তাই যা ঐ লেখাকে সম্ভবপর করে তোলে। সাহিত্য মনোসমীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়-আশয়ে পর্যটন করে দেরিদা দেখান লেখা কোনো বিশুদ্ধ ব্যাপার নয়। লেখার অশুদ্ধতা দেখিয়ে তিনি যে কোনো আইডেনটিটির অশুদ্ধতা নির্দেশ করেন। লেখার অশুদ্ধতা ও অপূর্ণতা দেখানো তাঁর দর্শনের আরেকটা স্ট্রাটেজি। ১৯৬৮ সালে সরবোনে ডিফারেন্স নিয়ে কথা বলার সময় এক শ্রোতা তাই মন্তব্য করেছিলঃ দেরিদা বারবার তাঁর পাঠকের

মনোযোগ খণ্ডিত ও বিভাজিত করে ফেলেন একদিকে, অন্যদিকে আমাদের অভিনিবেশকে তিনি একবার তাঁর বলার ধরনের দিকে এবং আরেকবার তাঁর বলবার কথার দিকে নিয়ে যান'। দেরিদা এর জবাবে বলেছিলেন ঃ এমন একটা পয়েন্টে আমি নিজেকে স্থাপন করতে চাই, যেখান থেকে দ্যোতিতকে দ্যোতক থেকে সহজে আলাদা করে ফেলা যায় না। অর্থাৎ অর্থ যে তার চোখে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, চিহ্নের বেশি মূল্যবান নয় এইটে তিনি ধরিয়ে দিতে চান। ব্যাপকার্থে, বিষয় থেকে বিষয়ীকে আলাদা করে নেওয়া দেরিদার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। দেরিদার এ বক্তব্য বিতর্কিত হয় খুব, এবং সে বিতর্ক আজো অব্যাহত। দেরিদার কথা মার্কিন সমালোচকদের অভিভূত করে। দেরিদা বলেন, আমরা যখন কোনো নামের কথা বলি, তখন ঐ 'নাম' কি কেবল কোনো ব্যক্তি অথবা প্রপঞ্চের নির্দেশক হয়? তা কি একই সঙ্গে rhetorical dimension বহন করে না? যে কোনো নামের মধ্যে বাস্তব মানুষ অথবা প্রপঞ্চের বাইরে কি একটা আলংকারিক ব্যঞ্জনা নেই?

দেরিদার মূল বিষয় আসলে 'লেখা', লেখার সৃষ্টিশীলতা, লেখার চাতুর্য ও নান্দনিকতা। সংস্কার, মনোগত ধারণা ও বিশ্বাস, অর্থের অভ্যেস, প্রথা ও বন্ধন ভেঙ্গে দেরিদা লেখার শিল্পকলাকে উঁচু করে তুলে ধরেন এবং এই লেখা ও তার শিল্পকলাই হয়ে ওঠে তাঁর দর্শন। লেখার ওপর এরকম এবং এতোটা জোর বিংশ শতাব্দীতে আর কোনো দার্শনিক দেননি। Joyce শব্দের শেষ দু-অক্ষর তাই দেরিদার চোখে পড়েনা, Joyce-এর মধ্যে তিনি দেখেন কেবল আনন্দ (joy) একেকটি নাম এভাবে একেকটি ইমেজে বদলে দেন দেরিদা। খেলা করেন এসব নিয়ে। একজন প্রথাগত সমালোচক টেকস্টের মধ্যে খোঁজেন 'সত্য', 'খাঁটি অন্তঃসার' এবং সেই খাঁটি সত্যকে টেকস্টের দ্বিতীয় ভূমিকা হিশেবে দাঁড় করান। বিপরীতে, দেরিদা, প্রাথমিক টেকস্টটাকেই নতুন প্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতার উৎস করে তোলেন। সমালোচক তাই ব্যাখ্যাতা নন, নিজেই হয়ে ওঠেন স্বনির্ভর লেখক। দেরিদার মূলকথা এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক লেখা হোক অথবা প্রতিদিনের ভাষা হোক — এর কোনোটাই 'নিরপেক্ষ' 'অপাপবিদ্ধ' 'বিশুদ্ধ' নয়। প্রতিটি লেখা এবং প্রতিদিনের ভাষা তার নিজের ভেতর অনেক পূর্বধারণা, সংস্কার ও সাংস্কৃতিক মুদ্রা বহন করে চলে।

জাক দেরিদার ভাষা-চিন্তা ও রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বের পটভূমিকায় ইতিহাস-ভাবনা এবং প্রগতিবাদে অনেক পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনগুলো এখনকার আধুনিক বইপত্র ঘাঁটলেই ধরা পড়ে, যদিও সমান অন্তর্দৃষ্টিতে সবাই এসব ব্যাপার ব্যাখ্যা করেন নি। আমরা ধরে নিই 'ইতিহাস' কেবলি সামনের দিকে এগোচ্ছে, ইতিহাস হলো প্রগতি-মাস্তুলের কর্ণধার আসলে কি তাই? ইতিহাস কি কেবলি প্রগতির দিকে ধাবমান?

আজ অনেক কথাই উঠছে: ফুকোয়ামা end of history-র কথা বলছেন, বোদরিলার্দ বলেছেন end of the social-এর কথা, টোওরেইন বলছেন, শিল্পবিপ্লবের সমাজ এবং আলোকপর্বীয় প্রতিশ্রুতির যবনিকার কথা। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ, কর্মযজ্ঞ, কারখানা, শিল্প ও অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলন, সামাজিক সম্পর্ক, সেক্স, মানবিক বিনিময় — ইত্যাদির দিকে তাকালে পরিবর্তনের চেহারাটাই কেবল চোখে পড়ে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আন্তর্জাতিকায়ন জাতি — রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিকল করে দিচ্ছে বলেও শোনা যায়। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের ফলেই এসব ঘটনা ঘটছে বলে ধরে নেওয়া হয়। পোলান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভেকিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সাম্যবাদ উঠে যাবার পর 'ইতিহাস' শেষ হয়ে গেল বলে ঘোষণা করেছেন ফুকোয়ামা। সাম্যবাদ উঠে যাবার কারণে 'সামাজিক বিকল্প' শেষ হয়ে গেছে, এমন মনে করার মধ্যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতা থাকতে পারে না। সাম্যবাদ উঠে গেলেও তার আইডিয়াটা কিন্তু উঠে যায়নি, এমনও নয় যে, উত্তর-পুঁজিবাদী সামাজিক বিকল্পের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।

শিল্পবিপ্লবোত্তর অগ্রসর পুঁজিবাদ উচ্চতম জীবনের বস্তুগত মান তৈরি করেছে, একথা যেমন সত্য, একইভাবে এ-ও সত্য যে, তা অনেক সমস্যাও জন্ম দিয়েছে। অনেককিছুর বিনিময়েই পুঁজিবাদী জীবনের স্ট্যান্ডার্ডটা এসেছে। কাজেই জীবনের মানোন্নয়নকে বিরাট প্রগতি ভাববার কোনো কারণ নেই। জীবনের মানে বদল ঘটেছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন সমস্যার। জীবনের মান উন্নত হওয়ার ঘটনা সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটেনি, একদিকে জীবনের মান উন্নত হয়েছে অন্যদিকে দারিদ্র্য বেড়েছে দ্রুতগতিতে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোজকার জীবনের গ্লানি

বেড়েই চলেছে গরিব দেশগুলোতে। জীবনের মান উন্নত হয়েছে, কিন্তু উন্নয়নের বরাদ্দ — তথা উন্নতি — সমান হয়নি। উন্নত দেশের লিবারল ডেমক্রাসি নাগারিকদের সুবিধে বাড়িয়েছে অনেক, কিন্তু সমস্যার সার্বিক নিরাকরণ এখনো অনেক দূরবর্তী। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, পরিবেশ বিনাশ, আণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রবৃদ্ধি, জলবায়ু ও আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তন বর্তমান পৃথিবীর জন্যে স্বস্তিদায়ক হতে পারেনি। সেজন্যে অনবরত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি, আর ক্রমাগত অনুসন্ধান চলছে সম্ভবপর বিকল্পের। সেই বিকল্পকে কেউ কেউ ইউটোপিয়া' না বলে 'র‍্যাডিকাল ইমাজিনারি' বলেছেন মিশেল ফুকো। সেজন্যে বলেন 'বর্তমান' নামক সময়ের ভাগটাকে খুব অনন্য মনে করার কোনো কারণ নেই, বর্তমানকে ইউনিক না বলে ইন্টারেস্টিং বলা যেতে পারে। সেজন্যে বর্তমানকে অনবরত বিশ্লেষণ করা দরকার, এর স্বভাবকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা দরকার, একে ভেঙে ভেঙে বুঝে নেওয়া দরকার।

আঠার ও উনিশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ও অব্যহিত আধুনিকায়নের পটভূমিকায় আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার জন্যে সমাজশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এই সময়টাকে আমরা আলোকপর্ব বলে জানি। আলোকপর্বের দার্শনিকেরা বিজ্ঞানের মূল্য, যুক্তির ক্ষমতা ও শক্তি, মানবিকতার অপ্রতিরোধ্য বিকাশের ধারণায় আস্থাবান ছিলেন। বিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে সামাজিক পরিবর্তনের আধুনিক ধারণা জন্ম লাভ করলেও, এবং এর প্রচারিত পরিপ্রেক্ষিত এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপর্ব হলেও, খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসে এর শেকড় প্রোথিত। প্রাথমিক গ্রিক ও হিব্রু চিন্তায় মানবিকতার বিকাশের যে ধারণা বিদ্যমান ছিল, খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্বে তার অব্যবহিত পরিণতি। গ্রিক চিন্তা ও খ্রিস্টিয় বিশ্বাস এই ধারণা তৈরি করে যে, ইতিহাস পরিবর্তনের পথ ধরে ক্রমঅগ্রসরমান, এবং মানবিকতা ক্রমশ এক নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে। 'আধুনিকতা' বলতে আমরা যা শুনি এবং বুঝি তা হয়ত এরকম নয়; কিন্তু সামনের দিকে চলার এবং প্রগতির দিকে যাবার বার্তা ধর্মীয় ধারণার মধ্যেও ছিল। 'ইতিহাস সামনের দিকে যাচ্ছে' — এ ধারণা আধুনিকতার মধ্যে আছে এবং ছিল, যদিও স্বর্গের দিকে যাচ্ছে কিনা সেটা ভিন্ন বিষয়। প্রাক্তন আধুনিকতায় ইতিহাসের ধারণা স্বর্গমুখী ছিল, এ হলো দুই ঘরানার

তফাত। যেমন The City of God- এ অগাস্টিন বলছেন, ইতিহাসের মধ্যে যে পরিবর্তনের দেখা আমরা পাই, তার মধ্যে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য বিদ্যমান, সে পরিবর্তন — উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্তন — এক লোকোত্তর গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অগাস্টিন ঐতিহাসিক অগ্রগতি ও বিকাশের চালিকাশক্তি হিশেবে গণ্য করেছেন। ইতিহাসের এবং পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পরবর্তীতে বদলায়, ধীরে ধীরে তার সেকুলার ভাষ্য গড়ে ওঠে।

সতের শতকের দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর যুক্তিবাদী ও নৈদর্শিক প্রকরণ। ইংরেজিতে যাকে rational philosophy ও empirical philosophy বলে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে যুক্তির সংগতি ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা শুরু হয় তখন থেকে। এভাবে বুঝবার জন্যে ব্যবহৃত হয় বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান পদ্ধতি। সামাজিক বিষয়ের বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ সামাজিক সমস্যা ও সংঘাতের নিরাকরণ হয়ত করে না, কিন্তু কমিয়ে আনে — এই ছিল উপরোক্ত ঘরনার সমাজতত্ত্বের লক্ষ্য। এভাবেই আধুনিকতার rationalization process-এর সূচনা ঘটে[৬৮]।

আধুনিকতার সূত্রে জীবনের বিভিন্ন আধুনিক রূপ ও রূপান্তর দেখা দেয় সমাজপরিসরে। গড়ে ওঠে একটা সমাজ-নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিতন্ত্রবাদী সমাজ। আধুনিকতার চরিত্রই এমন যে, তার মাধ্যমে সামাজিক ভাঙন ও রাজনৈতিক অস্থিতি গড়ে উঠতে বাধ্য, এবং তার সমাধান আধুনিকতার পক্ষে সম্ভবপর নয়, এমনকি কাম্যও নয়। মার্শাল বারমেন তাঁর বিখ্যাত বইতে তাই বলেছেন। আধুনিকতার সমস্যা অর্থাৎ অস্থিতিশীলতা ও রূপান্তরমূলকতাকে তাই প্রগ্রেসিভ ভাবা হয়েছে। আধুনিকতার ধারণাকে প্রগতির বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবার প্রবণতা আঠার শতকের দর্শনে লক্ষণীয়। এই প্রগতিশীল আধুনিকতার কেন্দ্র পশ্চিম ইউরোপ, যাকে ব্যারি স্মার্ট 'world growth story' বলেছেন। এ আধুনিকতা পশ্চিমের, এবং এর গুণাগুণও নির্ধারিত হয় পশ্চিমের প্রমূল্যাবলীর নিরিখ মান্য করে। আধুনিকতার এই হলো সেই বিখ্যাত ইউরোসেন্ট্রিক আখ্যান। এ আখ্যান থেকে এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করা হয় যে, 'পাশ্চাত্য' সভ্যতা হলো 'মানব' সভ্যতা; অর্থাৎ পাশ্চাত্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক উন্নয়ন এক বিশ্বজনীন বিবর্তনমূলক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার বার্তাবাহী। তবে সবাই যে এ

ধারণা পোষণ করতেন, এমন নয়। ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেন ঃ আধুনিক পাশ্চাত্যের (modern occident) টেকনিকাল র‍্যাশনালিটি কালক্রমে পাশ্চাত্যের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর (যেমন স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা, গণতন্ত্র) জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। শোপেনহাওয়ার ঐতিহাসিক প্রগতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজের অবক্ষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ফ্রিডরিখ নীৎশে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্রমাগত প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে, আধুনিকতার এই গল্প সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিলনা। এই তথ্যটি বুদ্ধদেব বসুর কাছে সম্ভবত পৌঁছেনি।

জ্ঞানের অসীম প্রগতিতে, কালক্রমে, পাশ্চাত্য ভাবুকদের অবিশ্বাস জন্মে। ইতিহাস আর প্রগতি যে হাত ধরাধরি করে সামনে এগোচ্ছেনা, একথা জানাজানি হয়ে যায়। মানবসভ্যতার বিবর্তনমূলক অগ্রগতিতে এখনকার কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা আর বিশ্বাস করেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিকতার সংকট দেখা দেয়, এবং এভাবেই পোস্ট-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজিবাদী সমাজের ভাবুকতা নতুন দিগন্তের দিকে মোড় নেয়। জাক দেরিদা, মিশেল ফুকো, জাঁ ফ্রাঁসোয়া লিওতার, জাঁ বোদরিলার্দ শিল্প-বিপ্লবোত্তর নতুন বুদ্ধিবৃত্তির সূচনা করেন।

'আধুনিক সমাজ' বলতে একসময় ইউরোপকেই বোঝাত, এখন তা বোঝায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আধুনিক সমাজের প্রতিভূ। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পার্সনস অন্তত তাই মনে করেন। পার্সনসের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক উন্নয়নের মডেল। পার্সনস আরো মনে করেন, পাশ্চাত্য সমাজের উন্নয়ন মানব ইতিহাসের আধুনিক পর্বে এক বিশ্বজনীন ভূমিকা রেখেছে। তারপরেও আধুনিকতার ভবিষৎ সন্দেহজনক রয়ে গেছে। আধুনিকতার প্রকল্প সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, সে এক ভিন্ন তর্ক; কিন্তু এ প্রকল্প প্রশ্নোর্ধ নয়, সংশয়হীন তো নয়ই। পার্সনস 'পোস্টমডার্ন' নামক ধারণ্যাকে অপরিণত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন; তাঁর মতে, আধুনিকতার ধারাক্রম একবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে।

আমাদের বক্তব্য হলো, সামাজিক সংগঠন আধুনিক হলেও তার মধ্যে এমন সব চিন্তা-ভাবুকতার জন্ম হতে পারে — এবং জন্ম হয়েছে — যাকে 'আধুনিক' বলা কঠিন। দেরিদা-ফুকো-লিওতারের ভাবনা আধুনিকতাবাদীদের সঙ্গে কি মেলে? মেলে না তো। তার মানে এই নয় যে, তাঁরা আধুনিক সমাজের বাইরে বা

পরপারে বাস করছেন! আধুনিক সমাজকাঠামোর মধ্যে উত্তরাধুনিক জিজ্ঞাসা তৈরি হতে পারে। .

এখন প্রশ্ন হলো, পোস্টমডার্নিটির সঙ্গে পোস্টকলোনিয়ালিটির মিল আছে কিনা। একটা কথা বুঝতে হবে যে, গ্লোবালাইজেশনের যুগে কোনো কিছুই আর আঞ্চলিক নেই, থাকবার উপায়ও নেই, সেজন্যে পোস্টমডার্নিজমের তাত্ত্বিক ও বিচারমূলক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবুকতা-জিজ্ঞাসার সম্পর্ক আছে। জাক দেরিদার কথা প্রথমে বলে নিয়েছি একারণে যে, উত্তর-ঔপনিবেশিকতার চিন্তার প্যাটার্ন যাতে বুঝতে সুবিধে হয়। বলাবাহুল্য জাক দেরিদা উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবুক নন। ইউরোপের বাইরে তাঁর দৃষ্টি এখনো পড়েনি।

উত্তর-ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে প্রথমে কিছু মোটা দাগের কথা বলা যেতে পারে। যেসব দেশ একসময় উপনিবেশ ছিল এবং পরে তার নিগড় থেকে মুক্ত হয়েছে, স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেসব দেশের নতুন বুদ্ধিবৃত্তিকে, উত্তর-ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তি বলা যায়। তার মানে উত্তর-ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তি হলো স্বাধীনতা-উত্তর বুদ্ধিবৃত্তি! তা নয় কিন্তু। Post-colonialism মানে যদি post-independence বা after colonialism হয়, তাহলে পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ হয়ে যায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা শেষ হয়ে যায় না। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা আসলে একটা বিরোধিতা, বিষমতা এবং প্রতিরোধের ডিসকোর্স। উপনিবেশের বিরোধিতা এর তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য, তাই উপনিবেশের মধ্যেই এর জন্ম হলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অধিকাংশ দেশে তাই হয়েছে। ঔপনিবেশিকতা ছাড়া উত্তর-ঔপনিবেশিকতার মতো অপজিশনাল ডিসকোর্স, উদ্ভূত হতে পারেনা।

'পোস্টমডার্নিজম' হল ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রীভূত, অর্থকেন্দ্রিক, প্রধান আখ্যানসমূহের বিপর্যয়; আর উত্তর-ঔপনিবেশিকতার প্রতিপাদ্য, সাম্রাজ্যবাদী ডিসকোর্সের কেন্দ্র-প্রান্তের (Center / margin) বিপরীত যুগ্মতার প্রত্যাখ্যান। কেন্দ্রের বিরোধিতা করে দুটো তত্ত্বই প্রান্ত ও প্রান্তিকতার পক্ষাবলম্বন করে। দুটো তত্ত্বেরই লক্ষ্য ডিসকোর্সকে বিকেন্দ্রিত করা। ব্যাখ্যার উদ্যম ও প্রকল্প হিশেবে দুটোই subversive উপাদানরাশি ব্যবহার করে এবং দুটোই ভাষার গুরুত্বের

ওপর সর্বাধিক জোর দেয়। ব্যাখ্যার স্ট্রাটেজি হিশেবে পোস্টমডার্নিজম ও পোস্টকলোনিয়ালিজম 'প্যারডি' ও 'আয়রনি'-কে গ্রহণ করেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যাবৃত্তি পোস্টস্ট্রাকচারালিজম থেকে অবাধে অনেককিছু গ্রহণ করেছে। উইলসন হারিসের একটি বই আছে 'ট্রাডিশন, দি রাইটার এন্ড সোসাইটি' (১৯৭৩) পড়ে মনেই হয় না এ কোনো উত্তর-ঔপনিবেশিক বই। বক্তব্য হয়ত তাই কিন্তু গোটা বইটার ব্যাখ্যা-পদ্ধতি এবং বর্ণনা-ভাষ্যের উপকরণ এবং ভাবনার ধরন — সবই উত্তর গ্রন্থনবাদ (post structuralism) থেকে গৃহীত। কার্তেসীয় ব্যক্তির প্রত্যাখ্যান, অর্থনির্মাণ ও অর্থবোধের অস্থিরতা, ভাষা অথবা ডিসকোর্সে বিষয়ের অনুসন্ধান, ক্ষমতার বহুরকম ক্রিয়া ঃ এসব উইলসন হারিস মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করতে পেরেছেন উত্তর-গ্রন্থনবাদের দান-দখিনা গ্রহণ করার কারণে। উত্তর-গ্রন্থনবাদ থেকে আবশ্যক পরিগ্রহণ ছাড়া বইটি লেখা হতে পারতো না।

তারপরও এমন মনে করার প্রয়োজন নেই যে, পোস্টকলোনিয়ালিজম একধরনের রাজনীতি-মেশানো পোস্টমডার্নিজম, কারণ উত্তর-ঔপনিবেশিকতার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে উত্তরাধুনিকতার কোনো মিল নেই। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা ঔপনিবেশিক ও নব্য-ঔপনিবেশিক সমাজসমূহের সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় অব্যাহত এক অভিনিবেশের কথা বলে, তার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব স্ট্রাটেজির নিরীক্ষা করে, যা দিয়ে ওই সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার বস্তুগত ও ভাবাদর্শগত অভিঘাত তদন্ত করা যায়, বিচার করা যায়, এবং সম্ভবপর হলে উপড়ে দেয়া যায়।

উত্তরাধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদের চরম উৎকর্ষ থেকে জন্ম নেয়া জিনিশ। যে দেশে একসময় বোদলেয়ারের জন্ম হয়েছিল, সেদেশে আজ যদি জাঁ বোদরিলার্দের দেখা পাই বিস্মিত হব কেন। পোস্টমডার্নিজম পৃথিবীর সব অংশের বাস্তবতাকে মনে রেখে উদ্ভূত হয়নি। হতে পারতো না। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা-বাদকেও একশো ভাগ এশিয়া-অফ্রিকার জিনিশ মনে করার কোনো কারণ নেই। পোস্টমডার্ন নামক কোনো যুগ বা সমাজের উদ্ভব যদি ঘটেও থাকে, তার মধ্যে যে আমরা বাস করার অধিকার পাইনি সে তো সত্য কথা। সমস্যা হলো উত্তরাধুনিক সমাজে বাস না করতে পারি, এর সংস্কৃতিক ও মতদর্শিক অভিঘাত থেকে — গ্লোবালাইজেশনের জমানায় — চাইলেই আমরা গা বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। সেজন্য পোস্টমডার্নিজমের বিকল্প ডিসকোর্স হিশেবে দেখা দিয়েছে উত্তর-

ঔপনিবেশিকতাবাদ। দুই ঘরানায় কিছু তাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রয়োগগত ও অনুশীলনগত পরিসরে তফাত বিরাট। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা অনেকটা রোমান্টিসিজমের ঘরানায় চলাচলে অভ্যস্ত, ট্রাডিশনাল সাহিত্য সমালোচনাতেও তার যাতায়াত, উপরন্তু এই দুই প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন তাত্ত্বিক কলকব্জা উদ্ভাবন করা উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যসমালোচনার লক্ষ্য।

যাঁরা উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক কিংবা ভাবুক কিংবা বুদ্ধিজীবী, তাদের সংখ্যা অল্প।[৬৯] বিশেষ একটা মত প্রকাশের জন্যে এঁরা দল বেঁধেছেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। 'দল' যদি হয়ও, তার সদস্য-সংখ্যা কিন্তু সামান্য। এসব বুদ্ধিজীবীর পেশাগত ক্ষেত্রে মিল আছে — অর্থাৎ সবাই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। এঁদের লেখাপত্র বিদেশেই ছাপা হয়, বিদেশের প্রকাশনা-সংস্থাই এঁদের বইপত্র ছাপে। এঁদের লেখাপত্র বিদেশের জার্নালেই প্রকাশিত হয়। এঁরা সাধারণত দেশের বাইরে কাজ করেন — তাঁরা হয় নির্বাসিত কিংবা স্বেচ্ছাপ্রবাস-গ্রহণকারী। বিদেশে লেখাপড়া করে বিদেশেই চাকরি-বাকরি পেয়েছেন এঁরা, এবং বিদেশেই রয়ে গেছেন। ক্যাওয়ামি অ্যান্থনি অ্যাপিয়াহ-র মত হল, উত্তর-ঔপনিবেশিক বুদ্ধিবৃত্তি ও চর্চাকে কমপ্রেডর ইনটেলিজেন্টসিয়া বলা যায়। তাঁর ধারণায়, এই ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা, প্রান্তের সঙ্গে বিশ্বপুঁজিবাদের সাংস্কৃতিক পণ্যের যে বাণিজ্য — তার মধ্যস্থতাকারী। ক্যাওয়ামি বলেন, যাঁরা আফ্রিকা থেকে এসে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক বাজারে মধ্যস্থতা করছেন, তাঁদের লেখার বিষয় কিন্তু 'আফ্রিকাই'। এ 'আফ্রিকা' অবশ্য অন্য আফ্রিকা; এটি তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন এবং পশ্চিমের সাংস্কৃতিক বাজার তা অপছন্দ করেনি। পাশ্চাত্যের মাধ্যমে উত্থাপিত আফ্রিকাকেই দুনিয়ার লোক আজ চেনে-জানে। এর সঙ্গে 'আফ্রিকার' যোগ কতটুকু, তা ভিন্ন বিষয়। বিশেষকারণে বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভাবিত আফ্রিকাকেই পশ্চিমের মানুষ বুঝবার চেষ্টা করছে এবং আনন্দ বোধ করছে। বাস্তব আফ্রিকার সঙ্গে এই উৎপাদিত ও বাজারজাত নতুন আফ্রিকার মিল আছে কি নেই, সেটা এখন আর ভাববার বিষয় নয়। অন্যদিকে আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব স্বদেশী অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীরা আছেন তাঁরাও, অ্যাপিয়াহ-র মতে, পশ্চিমের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। ওয়েস্টার্ণ মডেলেই আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেতনালোক ও বুদ্ধিবৃত্তি বিন্যস্ত। ওখানে তাই পাশ্চাত্যকে বাদ দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। ক্যাওয়ামি অ্যাপিয়াহ বলেন,

নগুগি ওয়া থিংও আজকের যুগের লেখকের মধ্যে যে রাজনীতির উদ্বোধনের কথা বলেন (তা লেখার রাজনীতি হোক অথবা লেখকের) তা বহুলাংশে 'ইউরোপের আঁভ-গার্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত এক ধরনের বাম আধুনিকতা'। পঞ্চাশের দশকে চিনুয়া আচিবি যেসব জাতীয়তাবাদী উপন্যাস লিখেছেন, তাও পশ্চিমের উপন্যাসের আদলে লেখা, এবং সেজন্যেই আদৃত। তবে মনে রাখা দরকার, মডেলে মিল থাকলেও অন্তঃসার, লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্যে মিল নেই। একটি কথাই ইঙ্গিত করতে চাইছি, তা হল ঃ পাশ্চাত্য ও পোস্টমডার্নিজমের সঙ্গে পোস্টকলোনিয়ালিজমের সম্পর্ক কিন্তু আছেই।[৭০]

উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদী লেখক হলেই যে খাঁটি এশিয়ার বা আফ্রিকার কিছু হয়ে গেল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। 'খাঁটি' বলতে কিছু থাকে কিনা, সে বিষয়ে দেরিদার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। 'খাঁটি' কিনা, 'সত্য' কিনা, 'নির্ভেজাল' কিনা, এগুলো খুঁজতে গেলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতার বয়ানের স্ট্রাটেজি ও স্বাতন্ত্র্য বোঝা সম্ভব হবে না। বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু লেখক ব্রিটিশ ক্যারিবিয়ান থেকে লণ্ডন মেট্রোপলিসে প্রবাসজীবন বেছে নিয়েছেন। দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছেন তাঁরা, লেখার ভাষা ইংরেজি, এবং মেট্রোপলিসেই বেশ মানিয়ে গেছেন, অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেন তাঁরা দেশ ত্যাগ করলেন, কেন বেছে নিলেন লণ্ডনের মতো একটা শহর, প্রবাসজীবনে তাঁদের সত্যিই গ্লানি আছে কিনা, লেখক হিশেবে স্বীকৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা এর পেছনে কাজ করেছে কিনা, প্রবাসে তাঁরা নিরাপত্তাহীন বোধ করেন কিনা, এই প্রবাস স্বদেশের শেকড় থেকে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হবার প্রয়াস কিনা — এরকম অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, উঠেছেও। সবসময় যে সুবিধেজনক উত্তর মিলেছে তা নয়। কেবল ব্রিটিশ ক্যারিবিয়ান থেকে নয়, প্রাক্তন উপনিবেশগুলো থেকেও বহু লেখক ও বুদ্ধিজীবী বিদেশবাস বেছে নিয়েছেন এই শতাব্দীতে। এঁরা হেডকোয়ার্টারের স্বীকৃতি অর্জনের অভিলাষে পৃথিবীর মহানগরগুলোতে জড়ো হয়েছেন, ভেবে দেখতে বলেন জর্জ লেমিং।

ইংরেজদের বিষয়ে আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের যেমন একটা পূর্বধারণা আছে, নানাকারণে আছে, এবং বহুকাল থেকে আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরাও তেমনি 'ব্রিটিশ প্রভু' সম্পর্কে একটা পৌরাণিক ধারণা গড়ে নেয় কৈশোর পার হবার আগেই। বয়স বাড়লেও, ইংল্যাণ্ডে চলে এলেও, এই পৌরাণিক ধারণার খুব একটা অদল-বদল হয় না। লন্ডন মেট্রোপলিসে বসে লেখার সময়েও

সেই আগের আইডিয়াটাই তাঁর মাথায় থাকে। ইংরেজদের শিক্ষা, রুচি ও নান্দনিকতা যে সর্বোচ্চ, এই বিশ্বাসে তাঁরা দৃঢ়ভাবে আস্থাবান। ডিকেন্স, হার্ডি, জেন অস্টেন, টমাস হার্ডি পড়ে তাঁরা ইংল্যাণ্ডকে আবিষ্কার করেছেন এবং মনের মধ্যে অনবরত উদ্ভাবন করেছেন — কাজেই তাঁদের বিশ্বাস থেকে টলানো যাবে না। এ কথা সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ সম্পর্কে সত্য। উপনিবেশের শিক্ষা-প্রোগ্রাম বিদেশ থেকে যেকারণে আমদানী করা হয়েছিল, তার ফল এইভাবেই ফলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে শিক্ষাবস্তু হিশেবে যা কিছু কেন্দ্র থেকে আমদানী করা হয়েছে, তার সবটাই ইংলিশ'। এ ঘটনা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রিটিশ আফ্রিকা, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ কিংবা বর্তমান বাংলাদেশ — সর্বত্রই সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় 'ইংরেজি সাহিত্য' বাধ্যতামূলক বিষয়। ইংরেজি ও ফরাশি সাহিত্য আফ্রিকার আধুনিক মনের নির্মাতা; এসব সাহিত্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে চালান না হলে 'আফ্রিকা' সভ্যতার আলো পেতো না, উপনিবেশ অন্তত এই জ্ঞানটা তৈরি করেছে। আফ্রিকা মানব ইতিহাসের শৈশব পার হয়নি বলে অনেক আগে জানিয়েছিলেন, হেগেল বলেছেন, আফ্রিকার কোনো 'আত্মচেতন ইতিহাস' নেই। আফ্রিকা যে মানব ইতিহাসের অচেতন কিংবা অর্ধচেতন শৈশবে রয়ে গেছে, তার নির্ভুল প্রতীক হিশেবে হেগেল নিগ্রোদের কথা উল্লেখ করেন এবং উল্লাস বোধ করেন, নিগ্রোদের তিনি আরণ্যক আদিম মানুষ ছাড়া কিছু ভাবতেন না। একদিকে নিগ্রোদের তিনি 'নৃতাত্ত্বিক উপাত্ত' ভেবেছেন, অন্যদিকে সভ্যতা ও ইতিহাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। হেগেল লিখেছেন ঃ[৭১]

> আফ্রিকা পৃথিবীর কোনো ঐতিহাসিক অংশ নয়; পৃথিবীর এই আরণ্যক ভূখণ্ডে কখনো কোনো উন্নতি ঘটেনি। ঐতিহাসিক আন্দোলন এতে ঘটেছে ইউরোপ কিংবা এশিয়ার স্পর্শে, পরবর্তীকালে, এবং কেবল উত্তরাংশে।

আফ্রিকাকে আমরা ভাল বুঝবো, যদি আমরা এর আদিম আরণ্যক অ-ঐতিহাসিক ও অ-উন্নত রূপের কথা চিন্তা করি। এটাই আফ্রিকার স্বাভাবিক রূপ। এই স্বাভাবিক নৈসর্গিক আফ্রিকা এখনো রয়ে গেছে

হেগেলের দর্শনে ইউরোপের বাইরের পৃথিবী অচেতন ও নিদ্রামগ্ন; অর্থাৎ অসভ্য ও বর্বর। কাজেই 'ইতিহাস' হলো ইউরোপের ইতিহাস, এবং ইতিহাসের প্রগতি ঘটেছে ইউরোপেই। ইতিহাসের পরিপূর্ণতা ইউরোপের ঘটনা বলে বিশ্বাস করেন এই দার্শনিক গুরুদেব হেগেল। সেদিক থেকে ঔপনিবেশিকায়নকে খারাপ কিছু

মনে করেন না পশ্চিমের দার্শনিকেরা; কারণ colonization তো civilizing mission। ইতিহাসের গতি ও প্রগতির আলোর বিশ্বজনীন বিকাশের জন্যেই তো ঔপনিবেশিকায়নের প্রয়োজন হয়েছিল। ঔপনিবেশিকায়নের ফলেই নাকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ইতিহাসের অধিকার লাভ করেছে এবং ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের নির্ভরতা বিভিন্ন কারণে প্রবল। আফ্রিকার তুলনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নানা কারণে স্বতন্ত্র। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ঔপনিবেশিকায়ন অনেক গভীর ও দৃঢ়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিভুবন তৈরি হয় ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের ওপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাংস্কৃতিক জাগরণের ভিত্তিই উপনিবেশবাদ। ফলে আফ্রিকায় যে—রকম উপনিবেশ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, ভারতবর্ষে হয়েছে- ওয়েস্ট ইন্ডিজে ত হয়নি। যদি সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কখনো লড়ে, তাহলে নিজেদের আবহমান মূল্যবোধের পুরো ভিত্তিটাকেই প্রথমে উপড়ে ফেলতে হবে। উপনিবেশবাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে বলে তাদের স্বাধীনতার চিন্তায় একটা নির্বিকারত্ব সবসময় লক্ষণীয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে উপনিবেশের সর্বপ্রধান উত্তরাধিকার 'ইংরেজি ভাষা'; ইংরেজি ভাষায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ কি দান করতে পেরেছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল একটা ঔপনিবেশিক ভাষায় রচিত তাদের সাহিত্যকর্ম পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। ইংরেজিতে লিখেছে তারা ঃ কিন্তু তার স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ আলাদা। কলোনিয়াল লিগাসি বহন করেও অসামান্য অনেক উপন্যাস রচিত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ইংরেজিতে রচিত হয়েছে সাহিত্য যদিও তা ইংল্যান্ডের ইংরেজি নয়। কিছুতেই নয়। 'ইংলিশ রাইটিং'-এ না হোক, 'ইংলিশ রিডিং'-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার কথা পৃথিবীর সর্বত্র আজ স্বীকৃত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংরেজি মেট্রোপলিসের ইংরেজি নয়, ইংরেজের ইংরেজি নয়; উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের ওয়েস্ট ইন্ডিজ — অন্তত দু'দশক আগে — তাকে কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে ফেলেছে। 'ইংরেজি' এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিজস্ব ভাষা। নিজস্ব হলেও সে ভাষা পৃথিবীর যে কোনো ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে আদৃত হতে বাধা নেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংরেজির প্রসঙ্গ তুললাম তার কারণ হলো ঃ ইংরেজি একটা ঔপনিবেশিক ভাষা: এ ভাষা উপনিবেশসূত্রে — ক্যারিবিয়ান দেশে, ভারতবর্ষে, আফ্রিকায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজে, অস্ট্রেলিযায়, ক্যানাডায়, নিউজিল্যান্ডে বিস্তার লাভ করে। সবদেশের ইংরেজি ভাষার কথা কিন্তু আমরা বলছি না। বলছি সেই ইংরেজির কথা, যা ইংরেজরা লেখেনি, লেখে না এবং কখনো লিখবে না। কোনো ইংরেজ লেখক ত্রিনিদাদের স্যামুয়েলের মত ইংরেজি লিখবে না, সেলভনের মত লিখবে না। উত্তর-ঔপনিবেশিক উপন্যাসে ইংরেজি এভাবে বিকেন্দ্রিত হয়ে পড়েছে। ভারতের অনেক ঔপন্যাসিকের কথা আমরা জানি, যারা ইংরেজিকে বিকেন্দ্রিত করেছেন, যাঁদের ইংরেজি সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ভাষা। উত্তর-ঔপনিবেশিকতার এ হলো এক গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজি। এটা বুঝলেই আমরা বুঝবো, পোস্টমডার্নিজম ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স কেন ভিন্ন হয়ে যায়।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যে 'আদারই' বাঙ্ময়। এই আদার উপনিবেশের সময়ের ছিল, কিন্তু তাকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি। পশ্চিমের আখানমালায় এদের উপস্থিতি নেই, থাকলেও তাকে কথা বলার অধিকার দেওয়া হয়নি। সাইমন ডুরিং তাই উত্তর-ঔপনিবেশিকতাকে একটা অনিবার্য প্রয়োজন হিশেবে চিহ্নিত করেছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যে সেই 'আদার'ই মুখর বাগ্মিতার পরিবেশ তৈরি করেছে, যারা মূলত সাম্রাজ্যবাদের শিকার। সেই আদারই আজ কথা বলছে, পশ্চিমের আখ্যান ও বয়ানে যাদের চেহারা ভিন্নভাবে আঁকা ছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক আদারের বাসনা, উপনিবেশ-মুক্ত কম্যুনিটির আত্মপরিচয়ের বাসনা। এই আদারকে পৃথিবীর সামনে এতদিন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। উত্তর-ঔপনিবেশিক আদার তার আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠা করতে চায় ভাষার মধ্যে দিয়ে, এই ভাষাই এক অর্থে আদার এবং এই ভাষাই ঔপনিবেশিক 'নির্বাক আদারে'র আইডেনটিটি। ভাষা এভাবে উত্তর-উপনিবেশিক ডিসকোর্সে — আইডেনটিটির উচ্চারক হয়ে উঠেছে। ভাষা তাই শুধুমাত্র ভাষা নয়, একই সঙ্গে তা সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও রাজনীতির প্রশ্ন। নগুগি ওয়া থিংগু মনে করেন উত্তর-ঔপনিবেশিক আইডেনটিটি ভূগোলে নয়, ভাষায় বিধৃত। এই ভাষার মধ্যে দিয়েই উপনিবেশের লেখক তার আইডেনটিটি প্রতিপন্ন করেন, তার অস্তিত্বের ঘোষণা দেন। এই ভাষাই ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখকের স্বপ্ন অর্থ কাম মোক্ষ; এ ভাষাই তার ঐশ্বর্য, দীপ্তি, ক্ষমতা।

উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ও সাহিত্যসৃষ্টিতে নজরুলের অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা একারণেই আজ গুরুত্বপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলাম যে ভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে বিদ্রোহী পুরাণ ও অসামান্য বাকপ্রতিমার বিন্যাস করেছেন, তা তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়নের জন্যে অতীব জরুরি। নজরুলের ভাষা-বিশ্লেষণ কম হয়নি, তাঁর বাকপ্রতিমা-কৌশলের চিত্তাকর্ষক আলোচনাও আকারে-প্রকারে বিপুল। আমরা শুধুমাত্র উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর পুরাণ ও প্রতিমায় আলো ফেলতে চাই। কারণ 'পড়লেই যথেষ্ট নয়, কিভাবে পড়ছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পড়াটাই যে সমালোচনা, এত আলোচনা-ব্যাখ্যান-উল্লেখের পরে তা বোধ করি আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

কলোনির প্রজাকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, প্রাণী, আগাছা কিংবা মানবজঙ্গলের বেশি কিছু মনে করে না। উপনিবেশের পরাধীন সময়কে স্বীকার করতে পারেননি বলেই নজরুল ভারতীয় ও পশ্চিম এশীয় পুরাণে বিচরণ করেছেন এবং বার বার খুঁজে বেড়িয়েছেন স্বাধীনতা ও মুক্তির দিগন্ত। নজরুল ইসলাম প্রচুর পরিমাণে পুরাণ ব্যবহার করেছেন এই স্বাধীনতার অন্বেষায়। পুরাণ-পর্যটনের ফলে নজরুল একদিকে নিজের বক্তব্যকে শিল্পময় করেছেন, অন্যদিকে এড়াতে পেরেছেন স্পষ্ট সাংবাদিক ভাষণের অবাঞ্ছিত ত্রুটি। তবে নজরুলের পুরাণ-ব্যবহারকে আমরা যতটা সহজ ঘটনা মনে করি, তা তত সহজ নয়। ভারতীয় পুরাণে নজরুল ইসলামের অবিস্মরণীয় মগ্নতা ও নিমজ্জনকে কি অতো সহজ ঘটনা মনে করা যায় ? নজরুল ইসলাম মক্তবের মুয়াজ্জিন আর মৌলবি ছিলেন, এ তথ্য মুহূর্তের জন্যে ভুললেও আমরা তার পুরাণ-ব্যবহারের অসামান্যতা ধরতে পারবো না।

নজরুল ইসলামের পুরাণ পুরনো নয়, এবং পৌরাণিক নয়। শুধুমাত্র অগ্নি-বীণার কথাই ধরি। উপনিবেশের বিরুদ্ধে আগুনের বীণা হাজির করতে গিয়ে নজরুল ইসলাম কখনো ইতিহাস, কখনো ঐতিহ্যের স্মৃতি, কখনো পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্যের বর্ণনা বা পুরাণের উল্লেখেই যদি তাঁর শৈল্পিক উদ্যম নিঃশেষিত হত, আমাদের আলোচনার আর দরকার হত না। পুরান হোক, ইতিহাস হোক, অথবা ঐতিহ্যের স্মৃতি হোক সমকালের জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত না হলে তার কাব্যমূল্য সামান্য। নজরুল ইসলামের কৃতিত্ব এখানে যে, পুরাণ ইতিহাস ঐতিহ্যকে তিনি সমকালের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং এভাবেই তাঁর

কাব্যের উপাত্ত পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে এবং বিকীরণ করেছে নতুন অর্থ, নবতর তাৎপর্য।[৭২] নজরুলের সৃজনপ্রতিভার স্পর্শে বদ্ধ বয়ানে নতুনভাবে রক্ত চলাচল শুরু হয় এবং এভাবে পুরাণের সুপ্ত সম্ভাবনা পুনরাবিষ্কৃত হয় তাঁর কবিতায়, সাহিত্যে, গানে। আমরা সবাই যে জগতে বাস করি তা আর যাই হোক সেই 'পৌরাণিক' জগত নয়, তা এক জ্বলন্ত বর্তমান; কিন্তু নতুন সৃষ্টিক্ষমতার দাক্ষিণ্যে পুরাণেরও চরিত্র বদল ঘটে, যার দৃষ্টান্ত নজরুল ইসলাম। পুরাণের যে নবজন্ম ঘটিয়েছেন নজরুল ইসলাম, তা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আনন্দের কথা, তা কেউ কেউ করেছেন। জন্মসূত্রে ভারতীয় আর ধর্মসূত্রে পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারই নজরুল ইসলাম দুই ঐতিহ্যের ব্যবহারেই সমান সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নজরুলের পুরাণ-ব্যবহার কেবল দক্ষতার দৃষ্টান্ত নয়, নয় শুধুমাত্র কাব্যকুশলতা ঃ পুরাণকে তিনি তাঁর সমগ্র সত্তার মধ্যে একীভূত করে ফেলেছিলেন ঃ[৭৩]

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন — জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে'—
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।

জটায়ুধারী শিবকে নজরুল ইসলাম যে রকম অপূর্ব চিত্রকল্পে বিন্যাস করেছেন এখানে, তার তুলনা বিরল। 'পুরাণ'কে নজরুল ইসলাম প্রেরণা করে তোলেন এইভাবে.এভাবে তার নবজন্ম ঘটান, এবং পুরান এভাবে — তাঁর কবিতায় — আলোহাওয়ার মতো অস্তিত্বের — কবিতার — অংশ হয়ে যায়। ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস ও অন্যান্য নৃ-বিজ্ঞানীদের মিথ-বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানি, 'পুরাণ' কখনো মরে না; আধুনিক যন্ত্রপৃথিবীতেও 'পুরাণ' তার অপ্রতিরোধ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকে। আমরা পুরাণের অস্তিত্ব টের পাই না, কিন্তু আমাদের অবচেতনে ও সামাজিক স্মৃতি-নির্জ্জন-আচরণ ও অভ্যাসে, এমন কি প্রতিদিনের হাজার রকম সক্রিয়তায় 'পুরাণ' তার প্রভাব রেখে যায়। শিব ও দুর্গাকে এতো বিচিত্রভাবে, ধ্বংস ও সৃষ্টির যুগল-অনুষঙ্গ হিশেবে, বাংলা কবিতায় আর কেউ ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। 'রক্তাম্বরধারিণী মা'-তে দুর্গার চণ্ডীরূপ এঁকে, 'আগমনী' কবিতায় তাকেই সৃষ্টির আবাহন-গীতে স্নিগ্ধ করে তুলেছেন ঃ[৭৪]

ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন —গীত চলুক!
দ্বীপ জ্বলুক!
গীত চলুক''
আজ কাঁপুক মানব কলকল্লোলে কিশলয়সম নিখিল ব্যোম।

[আগমনী]

একই ভাবে 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'শাত-ইল আরব', 'খেয়া পারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' প্রভৃতি কবিতায় নজরুল ইসলাম [illegible] মুসলিম ঐতিহ্যের যে পুনর্বিন্যাস করেছেন, তাঁর আগে বা পরে আর কারো পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি।

ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচীয় পুরাণ ঐতিহ্যকে নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ করে নজরুল ইসলাম যে ভাষা সৃষ্টি করেন, তা-ই তাঁর কবিতার নতুন আইডেনটিটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র তৈরি করে। এখানে বুঝবার কথা হলো, পুরাণের ব্যবহার অথবা আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার বাংলা কবিতায় নতুন ঘটনা নয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মদুমদারও[৭৫] আরবি-ফারসির যুতসই ব্যবহার জানতেন। কিন্তু তাঁদের ঐ শব্দ-ব্যবহার ছিল এক ধরনের দক্ষতা মাত্র, নজরুল ইসলামের শব্দ-ব্যবহার ও ভাষা উপনিবেশের ভেতর সম্পূর্ণ নতুন সাংস্কৃতিক উদ্যমের তাণ্ডব নিয়ে হাজির হয়েছে. সেজন্যে নজরুলের কবিতায় কত ধরনের দেশী-বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার ধ্বনিগুণ ও ছন্দগুণ কেমন — এসবের তালিকা করে কোনো লাভ নেই। শব্দ ও ভাষার মধ্যে দিয়ে নজরুল ইসলাম — কলোনির ডিসকোর্সে - যে প্রবল সাংস্কৃতিক সংঘাত ও আত্মপরিচয়ের লড়াই মূর্ত করেছেন, তাই খেয়াল করা জরুরি।

নজরুল ইসলামের কবিতায় আত্ম পরিচয়ের লড়াই, সংঘাত ও মুখোমুখি দ্বন্দ্বের প্রতীকায়ন — বহুস্থানে প্রত্যক্ষভাষণ আছে, তার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য সামান্য নয়। এতদিন সাহিত্যপাঠের প্রাক্তন অভ্যেসে আবদ্ধ থাকার ফলে 'সাহিত্য' যে 'কবিতার' মতই বিভিন্ন রকম ও অনেক রকম হতে পারে, এই বোধটাও আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 'সাহিত্য'-কে এতটা ছোট মনে করা হত না এবং সাহিত্যের দৃষ্টিও এতটা সংকীর্ণ ছিল না। ত্রিশোত্তর কাল থেকে যখন কেবল

'আধুনিক' নয়, 'আধুনিকতাবাদী' কবিতা লেখা হতে থাকল, এবং তার সূত্রে গড়ে উঠল বিশেষ ধরনের সাহিত্যরুচি, তখন থেকেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য আর স্বীকৃত হল না। প্রশ্ন উঠল, আধুনিক কবিতার সংকলনে নজরুল ইসলামকে জায়গা দেওয়া যাবে কিনা। আধুনিক কবিতার সংকলনগুলো আধুনিক কবিরাই যেহেতু সম্পাদনা করেছেন, সেজন্যে 'নজরুল ইসলাম' আধুনিক কালপর্বে একটা আস্ত সমস্যা হয়ে দেখা দেন। বঙ্গীয় আধুনিকতাবাদের নিরিখ মেনে এখনো আমরা সাহিত্য পড়ি, সেজন্যে সাহিত্যরুচির সমস্যা ও বিভিন্ন রকম সাহিত্যের স্বাদগ্রহণের সংকট এখনো মীমাংসিত হয়নি। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা ও উত্তরাধুনিকতার আলোচনা তুলে আমরা একথাটাই বলতে চেয়েছি যে, সাহিত্য বিষয়ে সকল প্রচলিত ধারণার পুনর্বিচার আজ অত্যাবশ্যক। নজরুল ইসলামকে সমসাময়িক লেখকেরাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, কিন্তু বিশেষ ধরনের আধুনিকতাবাদে প্রতিশ্রুত ও দীক্ষিত হবার কারণে তাঁদের মধ্যে সব সময় একটা দ্বিধা থাকতো। পশ্চিমের সাহিত্য ও বিশেষত আধুনিক কবিতার সূত্রে এই যে রুচি গড়ে উঠলো সাহিত্যের বিচার ও ব্যাখ্যায়, তা এখনো পর্যন্ত বিরাট সমস্যা। 'পশ্চিম' মানে যে শুধুমাত্র দু'একজন কবি বা দু'একটা উপন্যাস নয়, পশ্চিমের আধুনিকতার প্রকল্প যে টি. এস. এলিয়টের লেখায় শুরু বা শেষ হয়নি, এটি এখনো আমরা ঠিকমতো বুঝি বলে মনে হয় না।

কবিতাকে রাজনীতির সংশ্রবশূন্য মনে করে এ শতাব্দীর তিন-এর দশকের আধুনিক কবিরা খুব আনন্দ বোধ করতেন। অথচ যাঁদের লেখার অনুপ্রেরণায় এই ধারণা তাঁরা উদ্ভাবন করেন, যেমন টি. এস. এলিয়ট, ইয়েটস, পাউন্ড — এঁরা সকলেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের সাহিত্যে রাজনৈতিকতা প্রবলভাবেই ছিল। 'রাজনীতি' বলতে আমি 'মতাদর্শ' বোঝাচ্ছি, দলাদলি কোন্দল নয়। 'সাহিত্য' যত বিশুদ্ধই হোক, তা যেহেতু ভাষা আশ্রয়ে জন্ম নেয় বা উৎপাদিত হয়, তাই তার একটা মতাদর্শিক প্রান্ত থাকতে বাধ্য। রাজনীতি থেকে সাহিত্যকে মুক্ত রাখার যে প্রত্যয় ও বাসনা এলিয়ট-পাউন্ড-ইয়েটসের ছিল, তার মধ্যেই রাজনীতি আছে। রাজনীতিকে প্রতিরোধ করাই তাঁদের আধুনিকতাবাদের রাজনীতি। মিখাইল নরথ[৭৬] এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> The aesthetic can complete its assigned task and reconcile social and political contradictions only by remaining aloofly

> aesthetic: its political power rests in a way on its power to resist politics.

এ কারণেই এলিয়ট-ইয়েটস-পাউন্ড যে রাজনীতি করেছেন তা 'মামুলি রাজনীতি' নয়, তার পরিণতি অনেক ব্যাপক, সূক্ষ্ম ও গভীর। দীপ্তি ত্রিপাঠীর বই দিয়ে যাঁরা সাহিত্য পাঠ শুরু করেছেন, এবং বুদ্ধদেবের 'শার্ল বোদলেয়ার' যাঁদের আধুনিকতাবোধের বীজগ্রন্থ, তাঁরা আধুনিকতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক-সন্ধানে উৎসাহী না হবারই কথা। কিন্তু পাশ্চাত্যজগতে আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বহুকাল ধরে উদ্দীপক তর্কের বস্তু। পশ্চিমের সাহিত্যসমালোচনা যে ইন্টারডিসিপ্লিনারী হয়ে উঠেছে, এবং আমাদেরটা যে হয়নি, তার কারণ সাহিত্য সম্পর্কে ওদের বহুত্ববাদী ধারণা, এবং রাজনীতি ও মতাদর্শের সঙ্গে 'সাহিত্য' নামক ভাষাকেন্দ্রিক কাজের সম্পর্ক স্বীকার করার সাহস। আমাদের সাহিত্যধারণা রৈখিক, হ্রস্ব, মৌলবাদী। বুদ্ধদেবের মনোহর অনুবাদকর্ম ও তার ভূমিকায় আধুনিকতাবোধের চূড়ান্ত ও চিরন্তন লক্ষণাবলী সনাক্ত করে করে আমাদের এ দুর্গতি হয়েছে। এর পরিণতিতে শার্ল বোদলেয়ার হয়ে ওঠেন আমাদের সমকালীন, এবং বোদলেয়ারের মুদ্রা ও মুদ্রাদোষ দিয়ে বাঙালি মুসলমান কবির মাপজোক শুরু হয়। নজরুল ইসলামকে নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনসমূহের যে সমস্যা, তার গোড়া এইখানে।

আধুনিকতাবাদ কি রাজনীতি-বিরোধী কোনো নিষ্ক্রিয় নান্দনিক প্রপঞ্চ ? মোটেও নয়। মার্কুইসের মনে হয়েছে, আধুনিকতাবাদী আঙ্গিকের উদ্ভাবনশীলতা শুধু অপূর্ব নয়, বৈপ্লবিকও। 'বুর্জোয়া পুঁজিবাদ' কে যদি মডার্নিজম নিয়তি মনে করতো, তাহলে তার আঙ্গিক অতোটা র‍্যাডিকাল হতে পারতো না। আধুনিকতাবাদী সাহিত্য-আঙ্গিক দুরূহ, জটিল; এই জটিলতা-দুরূহতার মধ্যে দিয়ে আধুনিকতাবাদ একটা 'অপজিশনাল' ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। কারণ 'আঙ্গিক' সরল হলে 'বিদ্যমান'কে মান্য করা হয়, আধুনিকতাবাদ যা করতে চায়নি। মার্কুইস মনে করেন, মডার্নিজম যে স্বপ্ন তৈরি করে তা বুর্জোয়া সমাজের বাইরের বাস্তবতা; স্বপ্নের এই নির্মাণের মধ্যে একটা বৈপ্লবিকতা আছে। তবে আধুনিকতাবাদের স্বপ্ন জয়ী হয়নি — ব্যর্থ হয়েছে; এই ব্যর্থতাকেই মিখাইল নর্থ আধুনিকতাবাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলে নির্দেশ করেছেন।

গত বিশবছরে সমাজ ও রাজনীতির প্রভাবে বেড়ে ওঠা নারীবাদ, চিহ্নবিজ্ঞানও বিনির্মাণতত্ত্বের প্রভাবে — আগেই বলেছি—সৌন্দর্যের ধারণা ও সাহিত্যের ব্যাখ্যায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে কোন্ ঘরানার 'নন্দনতত্ত্ব' বলবো, আদৌ 'নন্দনতত্ত্ব' বলা যাবে কিনা, বললেও গ্রাহ্য হবে কিনা ভাবনার বিষয়। সঙ্গীততত্ত্বে[৭৭] পর্যন্ত এর প্রতিফলন ঘটেছে: ফলে সঙ্গীতের ব্যাখ্যায় — যাকে Musicology বলা হয় — বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। নজরুলের গানের আলোচনার কথা উল্লেখ করছিলাম এজন্যেই যে, সাম্প্রতিক সঙ্গীতব্যাখ্যার পদ্ধতি-প্রকরণ না জানলে নজরুলের সঙ্গীত সম্পর্কে পুনরাবৃত্তি কিংবা ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক আলোচনার বেশি কিছু জানা যাবেনা। শিল্প ও হিউম্যানিটিজের জগতটাই তো আজ বদলে গেছে, সেটার খোঁজ খবর না থাকলে চলবে কেন। প্রত্যেক সমালোচকই — কবিতায় হোক সঙ্গীতের হোক কথাসাহিত্যের হোক — নিজের মতো করে একেকজন শিল্পীকে নির্মাণ করেন। সমালোচনা সেজন্যে টেক্সটের প্রতিপক্ষ অথবা সমকক্ষ আলাদা আরেক টেক্সট। এই কাজে ভাল — খারাপের কোনো ব্যাপার নেই, মন্দ- উত্তমের ও কোনো ব্যাপার নেই। এই-ই হয়। সমালোচনা নিজেও এক 'টেক্সট' হয়ে উঠতে চায়, নতুন অর্থের সব কৌতূহলের উদ্দীপক হতে চায়। সমালোচনাকে স্বমূল্যে পাঠ্যবস্তু করে তুলতে চাইলে সমালোচনার বর্তমান গ্লোবাল পরিপ্রেক্ষিত আয়ত্বে থাকা কর্তব্য। নজরুলের কবিতার আলোচনায় দু'একজন সমালোচক যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, নজরুলের গানের আলোচনায় তার ছিটেফোঁটা স্বাক্ষরও নেই। নজরুল ইসলামের গানের উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ ছাড়া, আবারো বলি, তাঁর প্রতিভার মূল্যবিচার অসম্ভব।

মডার্নিজমের এবং দুশতাব্দীর সাহিত্যশিল্পের একটা প্রত্যয় ছিল, 'আর্ট' হবে অটোনোমাস'। শিল্প স্বাধীন। শিল্প সমাজ নির্ভর নয়, শিল্প স্বাধীনও নয়, শিল্প ও সৃষ্টিশীল কাজ এক ব্যাপক, গভীর কিংবা অব্যবহিত ডিসকোর্সের অংশ। শিল্পের কিছুই বহির্জগত ও অব্যবাহিত ডিসকোর্সের সংশ্রবশূন্য হয়না। শিল্প-ব্যাখ্যায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছে, তাতে মনে হয়না 'স্বয়ম্ভূ নান্দনিকতা' — অন্তত একবিংশ শতাব্দীতে কোনো মূল্য পাবে। এতদিন মনে করা হতো নতুন জিজ্ঞাসাগুলো হয়তো অন্যসব শিল্পকলাতেই উঠেছে, 'সঙ্গীতে'র সঙ্গে এর যোগ নেই। তা নয়। 'সঙ্গীত'কেও নতুন প্রশ্ন আর তর্কে নতুনভাবে পড়ে দেখার প্রস্তাব করা হয়েছে,

কেউ কেউ কপেছেনও। নতুন সমালোচনাতত্ত্ব 'মিউজিকোলজি' কে বদলে দিচ্ছে। রিচার্ড নর্টন তাঁর বইতে দেখাচ্ছেন যে, 'গ্রেট কম্পোজারদে'র কেন্দ্রীয় সঙ্গীতভাবনাকে এতোটা 'বিশ্বজনীন' মনে করার দরকার নেই [illegible] তাদের সঙ্গীতের ভাষা সামাজিক পরিসর থেকেই নির্মাণ করা হয়েছে। পোল ভালেরি, মালর্মে — এরা কবিতাকে সঙ্গীতের সমতুল্য করে তোলার জন্যে নিজেরা চেষ্টা করেছেন এবং সে অনুসারে তত্ত্বও খাড়া করেছিলেন। সঙ্গীতের শৃংখলাকে আপাতদৃষ্টিতে খুব বিমূর্ত আর সম্পর্কশূন্য দেখে তাঁরা একেই একমাত্র বিশুদ্ধ শিল্প-আঙ্গিক ভাবতেন। পোল ভালেরি সঙ্গীত শুনে শুনে বেশ মন খারাপ করতেন বলেও জনশ্রুতি আছে। তাঁর দুঃখ ও যন্ত্রণা ছিল এই যে, সঙ্গীতের যে উচ্চতা ও বিমূর্ততা, তা কি 'কবিতা' স্পর্শ করতে পারবে? কবিতা কি হতে পারবে সঙ্গীতের মতো বিশুদ্ধ, সুন্দর ও স্পর্শহীন? 'কবিতায় বক্তব্য থাকবেনা বা থাকা উচিত নয়' — এরকম এক প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন পোল ভালেরি। সঙ্গীতে ধ্বনির যে মহিমা, তা কবিতার মধ্যে আনা যায় কিনা, ভালেরি ভাবতেন। কবিতার ভাষাকে এমন উৎকর্ষ দেওয়া যায় কিনা, যা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে না; অর্থাৎ কবিতার ভাষাকে অনির্বচনীয় করে তোলা যায় কিনা, ভালেরিকে আমৃত্যু ভাবিয়েছে। মূল কথা হল, কবিতা ভাষা নির্ভর; অন্যদিকে সঙ্গীতের নির্ভর যে ধ্বনি, অর্থের বন্ধনমুক্ত করে কবিতায় তার ব্যবহার সম্ভবপর কিনা, এ ছিল ভালেরির কাব্যচিন্তার গোড়ার কথা। বোঝাই যাচ্ছে, 'সঙ্গীত'কে ভালেরি ও সমসাময়িক কবিরা সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প মনে করতেন, কেননা অর্থবোধকতার দুশ্চিন্তা সঙ্গীতকার না করলেও পারেন। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীতও অতোটা বিমূর্ত নয়, ডিসকোর্সের আবেষ্টনীতেই তা গড়ে উঠেছে — যদিও তাকে আমরা 'বিশ্বজনীন' ও 'বিমূর্ত' বলে এতদিন সরলভাবে জেনে বুঝে এসেছি। মজার ব্যাপার হল, সঙ্গীততত্ত্ব (Music theory) ও সঙ্গীতশাস্ত্র (Musicology) নামের ডিসিপ্লিনগুলো বিকশিত হয়েছে, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে সঙ্গীত একটা স্বাধীন স্বাবলম্ব শিল্প'। সঙ্গীতের জন্ম ও বিকাশেরও যে একটা ঐতিহাসিকতা আছে, সঙ্গীতও যে কোনো না কোনা মানুষ রচনা করে, কেউ কেউ যে তাতে সহায়তা দেয়, নির্দিষ্ট স্থানে যে তার জন্ম হয় এবং তার যে নির্দিষ্ট তারিখও আছে, এসব বিষয় সঙ্গীতের আলোচকেরা খেয়ালের বিষয় মনে করেন নি। সঙ্গীতকে তাঁরা মনে করেছেন সবকিছুর স্পর্শশূন্য এক নান্দনিক ব্যাপার, এবং নিজেদেরকে মনে করেছেন নিরপেক্ষ আলোচক। এ ধারণা যে

বিভ্রমচালিত, তা এখন আর গোপন নেই। সঙ্গীতকে স্বাধীন স্বয়ম্ভূ মনে করার মধ্যে 'সরল সঙ্গীতানুরাগী'র মতো একটা মনোভাবও কাজ করেছে — আমরা জানি, যারা গানের ভক্ত এবং গান শোনেন, তাঁরা এজগতের পরপারে চলে যাবার জন্যেই তা শোনেন এবং বিশুদ্ধ জিনিশের অভিজ্ঞতালাভের জন্যেই শোনেন। দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্য ও এশীয় সমাজের সংস্কৃতিতে'সঙ্গীত'কে unproblematized paradigm হিশেবে দেখা হয়েছে, যার সঙ্গে মামুলি সঙ্গীতভক্তের সরল মনোভাবের খুব তফাত নেই। সঙ্গীতকে ভাবা হয়েছে non- representational চরিত্রবিশিষ্ট, অর্থাৎ বিমূর্ত আজ দেখা যাচ্ছে 'সঙ্গীত' তা নয়, non-representational নয় বিমূর্ত নয়, বায়বীয় নয়; অর্থাৎ কেবলি নান্দনিক একটা ব্যাপার নয়; শিল্পকলার অন্যান্য শাখা প্রশাখার মতো তারও খুঁটিনাটি অনেক প্রান্ত আছে, যা বিচারের দাবি রাখে। সঙ্গীতকে এখন আর special ডট্রণ মনে করা যাচ্ছেনা। সঙ্গীতের সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক থাকে এবং মতাদর্শের ডিসকোর্সের হাজার সংকেতের সঙ্গে তার যোগ কোথায়, তার চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ আজ খুব দুর্লভ নয়। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আর সঙ্গীতের ডিসকোর্সের মধ্যে আদানপ্রদানের খবরের অনেক কথা সমালোচকেরা খুলে বলেছেন। সঙ্গীত শুধু মনোহর ধ্বনি সমাবেশ (organized sounds) নয়, এমন কি বাখ সঙ্গীতও (Bach's composition) তা ছিল না; সঙ্গীততত্ত্বের সংগতি বনাম হুল্লোড় নিয়ে অনেক রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছে, একথা মনে রাখা দরকার। পশ্চিমের চৈতন্যে 'সাহিত্যে'র চেয়ে অনেকটা ভিন্নভাবে সঙ্গীতের ভূমিকা কার্যকর, এর কারণ উদঘাটন করেছেন কেউ কেউ বিখ্যাত কম্পোজিশনগুলোও যে বিশুদ্ধ কিংবা বিশ্বজনীন নয়; ওসব কম্পোজিশনে বিকল্প কণ্ঠস্বরগুলোকে (নারীর, মাইনরিটির লোকজ সংস্কৃতির) নিস্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে কেন, তা ভেবে দেখা কারো কারো কাছে অত্যন্ত জরুরি মনে হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের বিশাল সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীতকর্মকে এতো আয়তন থেকে কেউ দেখার কৌতুহল বোধ করেছেন কি?

কাজী নজরুল ইসলাম উত্তর-ঔপনিবেশিক কবি। উপনিবেশ উঠে যাবার পরও অনেকদিন বেঁচেছিলেন তিনি; এবং আমরা জানি, নজরুল ইসলাম 'মাত্র একবার জন্মগ্রহণ করে দু'বার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। প্রথম মৃত্যু- এবং প্রধান মৃত্যু —১৯৪২ সালে, দ্বিতীয় মৃত্যু ১৯৭৬ সালে। প্রথম মৃত্যু অত্যন্ত শোকাবহ, দ্বিতীয় মৃত্যু দেহত্যাগের বেশী কিছু নয়। নজরুল ইসলামের প্রথম ও প্রধান মৃত্যু হওয়ার

আগে পর্যন্ত প্রকাণ্ড ব্যর্থতা ছাড়া তিনি তাঁর স্বপ্নের আর কোনো পরিণতি দেখেননি। বাংলাদেশ নামক যে স্বাধীন রাষ্ট্রে তার জীবনাবসান ঘটে, তা তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্নের সম্পূর্ণ বিপরীত এক বাস্তবতা। নজরুলের সমগ্র জীবনটাই একটা বিরাট টাজেডি ঃ প্রথম ট্রাজেডি পিতার মৃত্যুর অব্যবহতি পরে চাচার সঙ্গে নজরুলের মায়ের সম্পর্ক। নজরুল ইসলাম জীবনভোর এক জননী খুঁজেছেন, ঠিক 'মা' খোজেননি। অর্থাৎ 'আদর্শ জননী'র এক আর্কেটাইপ নিয়ে সারা জীবন তিনি তাকে খুঁজেছেন এবং পান নি। নজরুল ইসলাম এক বধূর আর্কেটাইপ নিয়ে সারা জীবন এক বধূ' খুঁজেছেন এবং পাননি। পাননি একারণে যে, 'আর্কেটাইপ' মানবমাস্তিষ্ক ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। তারপর তাঁর মনে হয়েছে 'ব্যক্তি' হিশেবে তিনি 'ব্যর্থ', এবং 'ব্যর্থ' হবার ফলে সমাজ পরিসরের রাজনীতিতে তিনি অবতীর্ণ হন। উপনিবেশের ভেতর এবার তিনি আদর্শসমাজের এক তৃতীয় 'আর্কেটাইপ' তৈরি করেন। 'আদর্শ সমাজে'র আর্কেটাইপ নিয়ে প্রায় এক যুগ সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পর তিনি তৃতীয়বার ব্যর্থ হন। প্রথমবার, দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার ব্যর্থ হবার পর নজরুল ইসলাম নির্জনের নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক অন্তঃপুরে ফিরে যান। কেননা এ ছাড়া আর কিছু নির্বাচনের সুযোগ তাঁর ছিল না। এপর্বেই নজরুল ইসলামকে একজন চরিতার্থ শিল্পী এবং গভীরতম সাধক হিশেবে আমরা পাই। এরপর আশা করি একথা আর কেউ বলবেন না যে, নজরুল ইসলাম সরল, সমতল, অগভীর জীবনযাপন করেছেন। যাঁর জীবনে একের পর এক এতগুলো ট্রাজেডি ঘটেছে, তাঁর জীবনকে অত সহজ মনে করার কোনো কারণ নেই।

এ আলোচনায় আমরা নজরুল ইসলামকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পাঠ করতে চেয়েছি। মিখাইল বাখতিন বলেছিলেন, সংলাপ হলো অস্তিত্ব— আর অস্তিত্ব হলো ঘটনা। নজরুল ইসলাম উপনিবেশের অবরুদ্ধ সময়ের ভেতর 'ভাষা'কে তাঁর অস্তিত্বের বিকল্প করে তুলেছিলেন, ভাষাই হয়ে উঠেছিল তাঁর অস্তিত্ব। নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবি নন, 'বিদ্রোহে'র কবি ঃ নজরুল ইসলামের ভাষার আরেক নাম 'বিদ্রোহ'। ভাষা নামক এই বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে, কলোনির ডিসকোর্সের ভেতর, বিকল্প ক্ষমতার এক বয়ান গড়ে তোলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি জানতেন কলোনির ভেতর গরিব কৃষকের ক্ষুধিত মজুরের 'বীর' হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু বলেছেন 'বল বীর!' তিনি জানতেন,

দারিদ্র্য কাউকে মহান করেনা— তবু বলেছেন 'দারিদ্র্য মোরে করেছ মহান'। তিনি জানেন, তিনি প্রলয়ের নটরাজ নন, সাইক্লোন নন, ঘূর্ণি নন, ধূর্জটি নন, ইস্রাফিলের মহা-হুঙ্কার নন, তবু বলেছেন তিনি তা-ই। বলেছেন- এজন্যে যে, ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের যুক্তিবাদ, শৃংখলা ও বিজ্ঞানমন্যতা তিনি এলোমেলো করে দিতে চান। আধুনিকতাবাদের দীক্ষায় আমরা জেনেছিলাম 'সাহিত্যে'র কোনো ক্ষমতা নেই এবং সাহিত্যের সঙ্গে কোনো কিছুর সম্পর্ক নেই ঃ কাজী নজরুল ইসলাম প্রমাণ করেন 'সাহিত্যে'র ক্ষমতা আছে এবং তার সঙ্গে বহুকিছুর সম্পর্ক আছে। প্রমাণ করেন, কবিতা লেখার লড়াইয়ে জেল খাটার গৌরব এক নজরুল ইসলামেরই ছিল। 'ভাষা'কে অস্তিত্ব করে তোলা এবং অস্তিত্বের অনুকূলে ভাষার স্বভাব বদলে দেওয়াকে তিনি মনে করতেন কবিতার চরিতার্থতা ঃ

কারার ঐ লৌহ—কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
          রক্ত জমাট
শিকল — পুজোর পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
          ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি'।[৭৮]

(ভাঙার গান)

অথবা

ঐ সে মহাকাল- সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র গানে ঝড়-তুফানে।
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে
          গগন -তলের নীল খিলানে ।[৭৯]

অথবা,

          পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীড়ে রে লাগে আগ
মরু   সাহারু গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!
          নুরে কুর্শির
          পুরে 'তূর' — শির
দূরে   ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরী ফুর্তির
ঝুরে   সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানী দুরানী তুর্কীর!
আজ   বেদুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া

          ছুড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে   'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম'।[৮০]

ভাষার আশ্রয়ে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিকতার মানচিত্র এভাবে আর কেউ ছেঁড়ে-ফেড়ে দিতে পেরেছেন কি? মডার্নিজমও একটা ঔপনিবেশিক প্রকল্প ঃ মডার্নিজম সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার যে বিশ্বজনীন আবেদনের কথা বলে, নজরুলের লেখায় তার উল্টো সংবাদ পাই। নজরুল ইসলাম যদি 'মানবতাবাদী' কবি হনও (বার বার এ শব্দই সমালোচকেরা ব্যবহার করেন), তার একটা আঞ্চলিক ও দেশভিত্তিক ধরন আছে। ইউরোপিয় হিউম্যানিজমকে আজকে 'খ্রিস্টিয়' বলা হয়, এটা যদি আমরা বুঝি; তাহলে এ-ও বুঝবো যে একটা বিশেষ সমাজ ও সময়ের পটভূমিকায় নজরুল ইসলাম মানবের মর্যাদার প্রশ্নটি তুলেছিলেন। নজরুল ইসলাম কলোনির খ্রিস্টিয় এবং বিশেষভাবে ইউরোপিয় — যা একই সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী ও 'বিশ্বজনীনতা'র লেবেলে বিমূর্ত — মানবতাবাদের ঘোর শত্রু। নজরুল সহজভাবে এটুকু বুঝতেন যে, সমুদ্রপাড় থেকে এসে দেশ দখল করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতন করে আর যাই হোক মানবতাবাদের কথা বলা যায় না। এদেশের তৃণমূললগ্ন কৃষক-শ্রমিক সর্বহারার রাজনৈতিক ইচ্ছা আর চৈতন্যের ডাঙাগুলোকে নজরুল ইসলাম ঠিকমতো জরিপ করে নেন।

দেবলোক আর পাপ-পুণ্যের আদিকল্পের ঘরানায় 'রাজা' ও দেশের শাসনের পুরনো ধারণা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর আপনাতেই ভেঙে যায়। সাধারণ মানুষ ইংরেজ রাজকে দেবতার আশীর্বাদ বা পাপপুণ্যের ব্যাপার মনে করেনি। তবে নিম্নবর্গের চৈতন্যে ঔপনিবেশিক ক্ষমতাও ব্রিটিশ রাজের প্রশাসন-নিয়ন্ত্রণ সহজ স্বাভাবিক ঘটনা হিশেবে কখনোই প্রতিভাত হয়নি। যদিও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই ও সংঘাতের চেহারা নানাসময়ে নানা আকার নিয়েছিল। নজরুল ইসলাম যেহেতু লোকায়ত সংস্কৃতি, জীবনধারা ও ফোকলোরের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, ফলে তাঁর পক্ষে সাবঅলটার্ণ চৈতন্য ও বিক্ষোভের অনুবাদ সহজতর হয়েছে। অক্ষরের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিশ্বাস জনগোষ্ঠীর সামূহিক নির্জ্ঞান থেকে প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করে নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় উপনিবেশ বিরোধী বিপদজনক বিদ্রোহ শুরু করেন। লোকজ প্রতিন্যাস থেকে শক্তি সম্পদ আহরণ করে কিভাবে সন্ত্রাসের ভাষা রচনা

করতে হয়, একবিংশ শতাব্দীর পাঠক 'অগ্নি-বীণা' পড়েই তা জানতে পারবে।

পাশ্চাত্যজগতে আলোকপর্ব-পরবর্তী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রগতি ও যুক্তিবাদের ধারক ব্যক্তিমানুষ।[৮১] এই যুক্তিশীল ব্যক্তিমানুষের সমবায়ে সেখানে গড়ে ওঠে সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ ঃ আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের মাধ্যমে যার অসুখী চৈতন্য — হেগেলের ভাষায় — চরিতার্থ। ঔপনিবেশিক ভারতে 'রাষ্ট্রে'র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যে নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নোর্ধ হলো, তার কারণ এই। ব্যক্তি মানুষের অধিকার কিংবা নাগরিক সমাজের ধারণা উপনিবেশের আগে এদেশে ছিল না; মজার ব্যাপার হল, এসব কথা অনবরত উচ্চারণের পরও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবাসীকে 'নাগরিক' হিশেবে কখনো স্বীকার করেনি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ যে এতটা শক্তিশালী হতে পেরেছিল, তার কারণ উপনিবেশের হাতে ছিল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের হাতিয়ার। ভারতবর্ষের সমাজ-জনগোষ্ঠীকে ঔপনিবেশিক বিশেষজ্ঞ নৃ-তাত্ত্বিক ও অরিয়েন্টালিস্টেরা কিছু তথ্য আর উপাত্তের ভিত্তিতে বুঝে ফেলার দুঃসাহস দেখাতেন। তাঁদের কাছে 'মানুষ' বড় ছিল না, বড় ছিল উপাত্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্য। যেহেতু যুক্তি আর বিজ্ঞানবাদ ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বৈধতা ও মতাদর্শের ভিত্তি, সেজন্যে ভারতবর্ষকে তাঁরা অসভ্য এবং আদিম অকর্ষিত উপত্যকার বেশি কিছু মনে করতেন না। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে এদেশে তাঁরা খ্রিস্টিয় উত্তরাধিকার আর ধর্মের চাষ-বাস শুরু করেন। অসভ্য ভারতবর্ষে 'নাগরিক' 'অধিকার' এসব কথার আবার মানে কি? নাগরিক নয়, ভারতীয়রা হচ্ছে 'প্রজা', পেনাল কোডই হচ্ছে শেষ কথা[৮২]। এভাবে ভারতবর্ষে যে অসীম শক্তিশালী স্বেচ্ছাচারী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তৈরি হল, তার মানবতাবাদ সাহিত্য যুক্তিবাদ বিজ্ঞানবাদ নজরুল ইসলামকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। নজরুল ইসলাম উত্তর-ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের জন্যে বেছে নেন 'ভাষা'। বাংলা ভাষার শক্তিপরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কলোনির সাংস্কৃতিক আধিপত্য 'ভাষা'র মধ্যে দিয়েই যে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া'র সূত্রপাত ঘটে, তা আজ আর অজানা ব্যাপার নয়। কেননা ভাষার একটা প্রমূল্যতন্ত্র থাকে — 'ইংরজি'রও ছিল — যার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স বিন্যস্ত হয়। মিশনারীদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও খ্রিস্টিয় মানবতাবাদের বিকাশ সম্ভবপর ছিল না বলেই তো ভারতবর্ষে 'ইংরেজি সাহিত্য' আমদানী করা হয়। যা ধর্ম পারে না, তা সংস্কৃতি পারে — একথা বোঝানোর

জন্যেই কি উনিশ শতকে ম্যাথু আর্নল্ড 'কালচার এন্ড অ্যানার্কি' (১৮৬৯) বইটি লেখেন নি? ইংরেজরা যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এটা 'বাইবেল' দিয়ে বোঝানো যেতো না বলেই তো ম্যাকলেদের গভীর দূরদর্শিতায় 'ইংরেজি সাহিত্যে'র মহত্ত্ব কীর্তিত হল এদেশে, সিভিল সার্ভিসের মত পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক করা হল ইংরেজি সাহিত্য। যে কাজ বাইবেল পারেনি, তা সেক্সপীয়র হার্ডি ডিকেন্স এলিয়ট সহজেই পেরেছেন।

ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্যাটার্নের আদলে যে সুশৃংখল বাংলা গড়ে উঠেছিল, নজরুল ইসলাম তার নির্দেশ মান্য করেন নি। নজরুলের জীবনবৃত্তান্ত না জেনেও তাঁর প্রতিরোধের সাহিত্য ও প্রত্যাখ্যানের নন্দনতত্ত্ব[৮৩] উপলব্ধি করা সম্ভবপর।

সব শেষে একটি কথা বলি। 'নন্দনতাত্ত্বিক বিচার' নামক সাহিত্যব্যাখ্যার যেসব নিরিখ আমরা মান্য করি, কাজী নজরুল ইসলাম তাকে অনবরত বিদ্রূপ করেছেন। আমার ধারণা, উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য-সংস্কৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রূপের গভীর তাৎপর্য আছে। সেজন্যে তাঁর সাহিত্য বিষয়ে রায় প্রদানের বদলে, তাঁর সাহিত্যপাঠের সমকালীন কিছু কৌশল ধরিয়ে দিতে চেয়েছি এ আলোচনায়। কাজী নজরুল ইসলামের টেক্সট যদি কলোনির কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা নন্দনতাত্ত্বিক নিরিখ আর ক্যাটেগরিগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে না দিত, এ মহৎ কবির লেখা নিয়ে আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনার সত্যিই কোনো মানে হত না।

তথ্যনির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

১. Raymond Williams, Keywords : a Vocabulary of Culture and Society (London : Fontana Press, 1983). দ্র. Aesthetic

২. Raymond Williams, পূর্বোক্ত

৩. J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms (London Penguin Books, 1979) p 17-20

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫ একজন বলেছেন ঃ The first duty in life is to be as artificial as possible. What the second duty is no one has yet discovered. S.J. A. cuddon, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৬ বলেছেন ঃ 'Live? Our servants will do that for us' পূর্বোক্ত।

৭ Raymond williams, পূর্বোক্ত

৮ নজরুল ইসলাম সভা-সমিতিতে সপ্রতিভ ভাষণ প্রদান করেছেন অনেকগুলো ঃ যেমন ১৯২৯ সালে দু'বার চট্টগ্রামে অভিভাষণ/ প্রতিভাষণ প্রদান করেন — প্রথমবার চট্টগ্রাম [illegible] রূপে; ১৯২৯ সালেই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সংবর্ধিত হয়ে কবি তাঁর বিখ্যাত অভিভাষণ প্রদান করেন ঃ ১৯৩২ সালের নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণ; ১৯৩৬ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব ও ভাষণ; ১৯৩৮ সালে জনসাহিত্য-সংসদে ভাষণ; ১৯৩৯ সালে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের মৃত্যুর পর আয়োজিত শোকসভায় সভাপতির অভিভাষণ; ১৯৪০ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ; ১৯৪০ সালে কলকাতায় 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং'-রুম এর দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ; ১৯৪০ সালেই, ডিসেম্বরে, কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বক্তৃতা; ১৯৪১ সালের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্যসভার চতুর্থ বর্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ) এবং ১৯৪১ সালেই তিনি কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে (৫ ও ৬ এপ্রিল ১৯৪১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলি উৎসবে সভাপতি-রূপে জীবনের শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন।

৯ যে-সমাজে নজরুর ইসলাম লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত তার এক বড় বাস্তবতা। নজরুল ইসলামকে মুসলমান সমাজ গ্রহণ করতে পারেনি। নজরুলকে লিখতে হয় ঃ

> 'আজ বাঙালি মুসলমানের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল আমাদের গোড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে। ...... ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি

> আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, ওমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান- হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারি, বেলালের প্রেম।

(১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি রূপে প্রদত্ত অভিভাষণ)।

অন্য অভিভাষণে বলছেন ঃ

> ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি — শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে — তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা এবং অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে

(১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি-রূপে নজরুল ইসলামের অভিভাষণ)।

১০. 'আমার ধর্ম' নিবন্ধে নজরুল ইসলাম বলছেন ঃ

> আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুররাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙাবার শক্তি যার নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে নিজের ঘরে পরে এসে অবহেলায় পশুর মত মেরে ফেলতে পারে, যার ভাই-বোন-বাবা-মাকে মেরে ফেললেও বাক্যস্ফুট করবার আশা নাই, তার আবার ধর্ম কি? দু'বেলা দু'টি খাবার জন্যেই যার বাঁচা, একটু আরাম করে কাল কাটিয়ে দেবার জন্যেই যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?

> মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি?

দ্রষ্টব্য নজরুল-রচনাবলী, আবদুল কাদির — সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলীর নতুন সংস্করণ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২৫ মে ১৯৯৩) চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৯।

১১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, শ্রেষ্ঠ নজরুল/নজরুল রচনাবলীর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংকলন (ঢাকা ঃ অবসর, ১৯৯৬) পৃ. ৬২১-২৬।

১২. নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলীর নতুন সংস্করণ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২৫ মে ১৯৯৩) পৃ. ৯০।

১৩. প্রধান ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে জন কীটস (১৭৯৫ - ১৮২১) ছিলেন তরুণতম। ১৭৯৫ সালের ৩১ অক্টোবরে লণ্ডনের মোটামুটি ভাল নিম্নমধ্য পরিবারে জন কীটসের জন্ম হয়। ১৮০৪ সালে দুর্ঘটনায় কীটসের পিতার মৃত্যু হয়, আর টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দু'বছর (১৮১০) পর তাঁর মা মারা যান। এ দুই মৃত্যু কীটসকে বার বার হানা দিয়েছে। তাঁর কবিতায় মৃত্যুর এই ছায়াপাত অনবরত দ্রষ্টব্য। এনফিল্ড একাডেমিতে ব্যাপক অধ্যয়ন-তপস্যায় মগ্ন হওয়া ছাড়া তাঁর শৈশবের আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। ১৮১১ সালে স্কুল ত্যাগ করে এক শল্যচিকিৎসকের অধীনে তিনি শিক্ষানবিশি করেন, ১৮১৬ সালে শল্যচিকিৎসার লাইসেন্স লাভ করেন কীটস। কীটসের মন ছিল নিরীক্ষামূলক, ফলে মেডিক্যাল ট্রেনিং তাকে সাহায্য করে। Ideal -এর সঙ্গে Actual- এর ভারসাম্য আনতে পেরেছিলেন তিনি এভাবে।

১৮১৪ সাল থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা—'হে নির্জনতা'; এটি ছিল একটি সনেট, যা ১৮১৬ সালের ৫ মে, 'দি এক্সমিনার' কাগজে ছাপা হয়। এরপর এক বন্ধুর সহযোগিতায় কাগজটির সম্পাদক লেইগ হান্ট কীটসকে অনুপ্রাণিত করেন। তারপরের ইতিহাস সবাই জানেন। চিকিৎসা ছেড়ে কবিতার সাধনায় মগ্ন হন কীটস। কীটসের লক্ষ্য ছিল, 'ইংরেজ কবিদের একজন হওয়া' (এইচ. ই. রলিন্স-

সম্পাদিত কবির চিঠিপত্র, ১৯৫৮ প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪) ঃ কীটস তা হয়েছিলেন। নিজের লক্ষ্যকে কীটস যে-বাক্যে প্রকাশ করেছেন, তাতে ইংরেজি সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কীটস জানতেন, যে-ভাষায় তিনি লিখছেন, চসার স্পেনসার, শেক্সপীয়র তারই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। জীবৎকালে কীটসের কবিতার ৩টি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়

নিসর্গের সৌন্দর্যমুক্ত এই কবি মিল্টন ও দান্তে পাঠ করে তাঁর কাব্যস্বভাব মার্জিত করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীল সময় অতীব সংক্ষিপ্ত (১৮১৮-১৯)। বাবা-মার মৃত্যুর পর কীটস পুনরায় ধাক্কা খান ঃ (ক) ভাই জর্জের মার্কিন মুলুকে পবরাস (জুন ১৮১৮) এবং (খ) ভাই টম-এর প্রথমে অসুস্থতা ও পরে মৃত্যু (১ডিসেম্বর, ১৮১৮)। অসুস্থ ভাই টমের সেবা- শশ্রূষার সময় — সম্ভবত — কীটস টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত হন। ডাক্তারের পরামর্শে কীটস ইটালি গেলেন (সেপ্টেম্বর ১৮২০) বটে, কিন্তু পাঁচ মাস পর রোমে তাঁর মৃত্যু হল (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮২১)। কীটসের সমস্ত লেখাপত্র ও সৃজনীকর্মকে সমালোচকেরা এক অপূর্ব spiritual' autobiography' বলেছেন। নিসর্গ, প্রকৃতির শোভা ও শিল্পের সৌন্দর্যের প্রতি কীটস যেভাবে সাড়া দেন, তার সঙ্গে ধর্মীয় এষণার খুব তফাত নেই। কীটসের বিশ্বাস ছিল, Beauty must be the sensuous token of ultimate truth। তিনি ভাবতেন, সৌন্দর্য হল পরম অজ্ঞাত বাস্তবতার এক অস্থায়ী প্রকাশ, যা আমাদের অভিজ্ঞতার পৃথিবীকে অর্থ দেয়। সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্কে কীটস সবসময় মান্য করেছেন। তবে একদিকে নৈরাত্ম্যসিদ্ধি অনাদিকে জ্ঞানের জন্যে বাসনা কীটসের কবিতায় এক মনোহর দ্বন্দ্ব হিশেবে সব সময় কাজ করে গেছে। অনুভূতি এবং চিন্তার যে সৃষ্টিশীল দ্বৈরথ কীটসে আছে, তাই তাঁর কাব্যকে অপ্রতিরোধ্য করেছে।

5. Jean Raimond and J. R. Watson ceds). A Handbook to English Romanticism (London : The Macmillan Press. 1994) P. 149-151

১৪ নজরুল রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) পূর্বোক্ত।

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

১৬ পূর্বোক্ত

১৭ আলাউদ্দিন আল আজাদ, নজরুল কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক পরিমাপ (ঢাকা ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ষোড়শ সংকলন ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪) পৃ. ৩। লেখক ঠিকই বলেছেন ঃ 'এ এক চিরন্তন প্রশ্ন, যার উত্তর নিরন্তর অন্বেষণ।'

১৮ নজরুল -রচনাবলী , পূর্বোক্ত

১৯ নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত , পৃষ্টা ১০২

২০ নজরুল -রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২১. নজরুল -রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২২ পূর্বোক্ত পৃ. ৩৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৬. নজরুল ইসলামকে 'রোমান্টিক' কবিও বলা হয়।এর কারণ,তাঁর কবিতায় কল্পনার বিশেষ ধরনের ব্যবহার এবং কল্পনার উপর তাঁর বিশ্বাস। নজরুল ইসলামের প্রকৃতি-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা, নিসর্গপ্রেম, প্রেম, সত্য-সুন্দর সম্পর্কিত অনেকধরনের উচ্চারণের সঙ্গে ইংরেজি রোমান্টিসিজমের মিল লক্ষণীয়। 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' নামের প্রবন্ধ লিখলেও ইংরেজি কিংবা বিশ্বের সাহিত্য তিনি ধারাবাহিক পাঠ করেছেন, এর প্রমাণ নেই। তবে ফারসি সাহিত্য যে যিনি ধারাবাহিক পাঠ করেছিলেন এবং সঙ্গীতও যে প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলায় চর্চা করেছিলেন, এর প্রমাণ বিস্তর। ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলী কীটস বায়রণ ওয়ার্ডওয়ার্থ তাঁর প্রিয় ছিল।নজরুলের কবিতাকে যদি 'রোমান্টিক' বলতে হয় তাহলে ফারসি কবিতা ও উর্দু গযলের ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে বলতে হবে। নজরুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব রোমান্টিসিজম তৈরি করেন ফারসি সাহিত্যও উর্দু গানের ঐতিহ্যর সূত্রে। যা'রা ফারসি ও উর্দু সাহিত্য পড়েছেন, তাঁদের কাছে একথা প্রায় দিবালোকের মত সত্য।

তবে ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা থেকে যিনি সুন্দর, প্রকৃতি,সত্তা, প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা লাভ করেন। নজরুলের গদ্যে এসব বিষয়ে যেসব কথাবার্তা আছে, তার সঙ্গে রোমান্টিক ইংরেজি কবিদের বিভিন্ন বিশ্বাসের মিল পাওয়া যায়। রোমান্টিসিজমে 'প্রকৃতি' একটা প্রধান বিষয় হিশেবে আবির্ভূত। 'প্রকৃতি' রোমান্টিকদের লেখায় একটা বড় প্রসঙ্গ হিশেবে দেখা দেয় নানাকারণে। আঠারো শতকে শিল্পবিপ্লবের বিকাশ এর একটা প্রধান কারণ। আঠার শতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে সড়কপথ ও যোগাযোগের উন্নতি ঘটে ইংল্যান্ডে, এর ফলে প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করা আগের চেয়ে সহজতর হয়। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সড়কপথ উন্নয়ন,বাগানের বিস্তার, গাইড বুক প্রকাশের ফলে 'প্রকৃতি' কবিদের কাছে বিশেষভাবে মনোযোগ পায়।'প্রকৃতি' হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের অঙ্গ ঃ প্রকৃতিকে কবিরা দেখলেন, শুনলেন, ঘ্রাণের মধ্যে দিয়ে অনুভব করলেন। ভার্জিলের লেখা পড়ে নয়। এবার প্রকৃতি — সন্দর্শন বাস্তবেই ঘটলো কবিদের। প্রকৃতির প্রভাব অনুভূত হলো তাঁদের মনে এবং হৃদয়ে। কাজের দুনিয়ার বাইরে প্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য আবিষ্কার করলেন তাঁরা। ধীরে ধীরে 'প্রকৃতি' আর কিছু সুন্দর দৃশ্যের বৃক্ষমালা বা আরণ্য বৈভবের সমাহার হয়ে থাকলোনা, হয়ে উঠলো পরমব্রহ্মের প্রকাশ। শীল হ্যারল্ড বললেন, আমি আমার মধ্যে বাস করিনা, বরং হয়ে উঠি/তার অংশ যা আমার চারপাশে আছে ('I live not in myself, but I become / Portion of that around me')। কবিরা অতঃপর প্রকৃতির স্বভাব খুঁজতে শুরু করলেন, অনুসন্ধান করলেন প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যের উৎস কোথায়। The Prelude- এ ওয়ার্ডওয়ার্থ লক - প্রমুখের প্রতিবাদ করে বললেন, প্রকৃতির মধ্যে এমন impulses আছে, যা বইতে নেই। প্রকৃতি এবং মানুষের আন্তরক্রিয়া ওয়ার্ডওয়ার্থকে অভিভূত করে রাখে। এভাবে কবিরা প্রকৃতির সৌন্দর্য শুধু নয়, তার শক্তিও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলেন। কোলরিজ এবং উপান্ত্য — পর্বের শ্রেণী প্রকৃতিকে প্লাটোনিক ও নিও-প্লাটোনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের বিপরীতে 'প্রকৃতি'র নতুন ভাষা তৈরি হল রোমান্টিক কবিতায়।

রোমন্টিকেরা 'কল্পনা' সম্পর্কে স্বতন্ত্র এক বিশ্বমের প্রবক্তা। রোমান্টিকেরা আবিষ্কার করেন 'কল্পনা'র আশ্চর্য শক্তি ও ক্ষমতা; তাঁরা বিশ্বাস করেন, একমাত্র সৃষ্টিশীল মানুষই কল্পনাকে অস্তিত্বের একটা স্বাধীন নিয়মে নিয়ে যেতে পারে। মানুষই তৈরি করে ইউটোপিয়া; যা

মানব প্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি। কল্পনার সহযোগেই মানুষ সৃষ্টি করে 'প্রতীক' যা পৃথিবীকে পাঠ করার বিশেষ একটি ভঙ্গি। ব্লেক তো এমনও বলেছেন যে, 'প্রকৃতি নিজেই কল্পনা'। অর্থাৎ বহির্জগতের ওপর কবির নির্ভরতাকে তিনি স্বীকার করলেন না। কোলরিজ আরো ধাপ এগিয়ে বললেন, যখন আমরা কোনোকিছু বোধ করার একেবারে প্রাথমিক স্তরে থাকি, তখনও 'কল্পনা' সক্রিয় থাকে! তবে কবির অথবা শিল্পীর কল্পনা আরো অগ্রসর : কবি অথবা শিল্পী বিষয়কে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করার তাগিদে 'কল্পনা'র বিশেষ সৃজনীবিকাশ ঘটান। সেজন্যে, কোলরিজের মতে, কবি বস্তুজগতের নকল করেন না, পুর্নগঠন করেন। কারণ কবির আছে কল্পনাপ্রতিভা ঃ imagination আর fancy যে এক জিনিশ নয়, এইটে তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান কল্পনা (imagination) যে fancy-র মতো 'ready made materials' নিয়ে নকলের কাজ করেনা, তাঁর প্রমাণ দেন তিনি The Rime of the Ancient Mariner Kubla Khan' কবিতায়। উত্তরকালে 'কল্পনাকে রোমান্টিক কবিরা তার মার্গীয় স্তর থেকে নামিয়ে আনেন; ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন, কবি হলেন a man speaking to men' (Lyrical Ballads- এর ভূমিকা); কীটস বললেন, 'কল্পনা'র মধ্যে দিয়ে পুরো মানব সম্প্রদায়ের চৈতন্যের শোধন সম্ভবপর ব্লেক থেকে বায়রণ পর্যন্ত সকল রোমান্টিক কবি 'কল্পনাকে লড়াইয়ের মতো ব্যবহার করেছেন — অর্থাৎ সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগত জীবনকে যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়, সীমাবদ্ধ করে দেয়, এরা সকলে 'কল্পনা'র অস্ত্র দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

'কল্পনা' 'প্রকৃতি' প্রভৃতি বিষয়ে রোমান্টিকদের ধারণার সঙ্গে নজরুল ইসলামের বিশ্বাসের যোগ আছে।

২৭. পোস্টমডার্নিজম অভিজ্ঞতার সংকোচনে অবিশ্বাসী। দীনেশ চক্রবর্তী 'শীতলা দেবীর' পূজোর উদাহরণ দিয়ে এ সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর পি এইচ ডি- অভিসন্দর্ভেও সম্পর্কে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দ্র. Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working-Class History : Bengal 1890-1940) New Jersey : Princeton University press, 1989)

২৮. সুন্দর কি এবং সৌন্দর্য কাকে বলে এনিয়ে বাংলায় চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' তে (কলকাতা ঃ রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৫)। ধ্রুপদী নন্দনতাত্ত্বিকদের সৌন্দর্যধারণা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আলোচনা অসাধারণ। এ বিষয়ে একাডেমিক আলোচনা পাই সুধীরকুমার দাশগুপ্তের বইতে, রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' (কলকাতা ১৯৬৭) আধুনিক সাহিত্য' (কলকাতা, ১৯৭১) সাহিত্যের পথে (কলকাতা, ১৯৫৮) 'সাহিত্যের স্বরূপ' (কলকাতা, ১৯৬৫) — যথাক্রমে রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৮ম, ৯ম, ২৩ তম, ২৭ তম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত — প্রভৃতি বইতে এ সম্পর্কে অনেক উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে। নন্দলাল বসুর শিল্পকথা (কলকাতা ১৯৪৪) শিল্পচর্চা (কলকাতা ১৯৫৩) রূপাবলী (কলকাতা ১৯৫৫) প্রভৃতি বইপত্রেও মনোজ্ঞ আলোকপাত পাই। সাধন কুমার ভট্টাচার্যও এ সম্পর্কে অনেকগুলো একাডেমিক আলোচনাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অন্নদাশংকর রায়ের 'আর্ট' (কলকাতা, ১৯৬৮) বইটির কথাও মনে পড়ে। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রূপ, রস ও সুন্দর' (কলকাতা ঃ ঋদ্ধি ইন্ডিয়া, ১৯৮৯)

বইতে। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' (কলকাতা ঃ চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২) বইটি এক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কাজ।

২৯. Terry Eagleton- এর এ বই পড়ার আগে তাঁর অন্য দু'খানা বই দেখে নেওয়া জরুরি " (ক) Criticism and Ideology (London New Left Books 1976) . (খ) Literary Theory : "An Introduction (Oxford : Basil Black well, 1983) আর টেরি এগলেটনের উদ্ধৃত বইটি বার হয় অক্সফোর্ড থেকে, ১৯৯০ সালে।

৩০. এ ধারার উল্লেখযোগ্য সমালোচক প্রফেসর হোমি ভাভা, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক হোমি ভাভার কিছু বইয়ের নামঃ Homi K. Bhabha (ed.) , Nation and Narration (Londan Routledge, 1990) : The Location of Culture (London and New york Routledge 1995) Gayatri Chakravorty Spivak — এর দুটি উল্লেখযোগ্য বই ঃ In Other Worlds : Essays in Cultural Politics (New york : Methven, 1988); Outside in the Teaching Machine (New York and London : Routledge, 1993). এছাড়া এডওয়ার্ড সাইদের Orientalism : Western Representation of the Orient (London Routledge and kegan Paul, 1978) Culture and Imperialism (London : Chatto & Windus, 1993) বই দু-খানাও দ্রষ্টব্য। এডওয়ার্ড সাইদের ব্যাখ্যায় তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন এজাজ আহমদের In theory : Classes, Nations, Literatures London & New york : Verso, 1992) বইতে

৩১. নজরুল-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত নতুন সংস্করণ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ১১

৩২. নজরুল রচনাবলী', পূর্বোক্ত

৩৩. নজরুল রচনাবলী', পূর্বোক্ত

৩৪. 'ছায়ানটের 'চৈতী হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোলে'র সিন্ধু ঃ প্রথম তরঙ্গ', সিন্ধু দ্বিতীয় তরঙ্গ 'সিন্ধু-তৃতীয় তরঙ্গ' কিংবা 'চাঁদনী রাতে', অথবা 'চক্রবাক'-এর 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি'র কথা কি আমাদের মনে পড়ে?

৩৫. আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল -রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন দ্রষ্টব্য

৩৬. Michel Foucault, Politics, Philosophy, Culture : Interviews and Other Writings 1977- 1984 (New york and London: Routledge, 1990). গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন লরেন্স ক্রিটজম্যান, দ্রষ্টব্য ঃ Sexual Choice, sexual Act : Foucault and Homosexuality p 286

৩৭. Robert J. C. Young, Colonial Desive : Hybridity in Theory, Culture and Race (London and New york : Routledge, 1995).

৩৮. নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা অনবদ্য। তারপরও একটা দোটানা তাঁর আছে, দু'জন সম্পর্কেই। রবীন্দ্রনাথের শেষদিককার কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের নীরবতা সন্দেহজনক। 'বিদ্রোহী' ও নজরুল ইসলামের উত্থান সম্পর্কে বুদ্ধদেবের

বর্ণনা সবচেয়ে সত্যভাষী, কিন্তু তিনি দ্বিধামুক্ত হতে পারেন নি যেন। 'নজরুল ইসলাম' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকায় নজরুল সম্পর্কে আরো কিছু মন্তব্য করেন।

প্রগতি (ফাল্গুন ১৩৩৪) বুদ্ধদেব লিখেছেন ঃ

> নবপ্রসূত 'মোসলেম' ভারতে যেদিন নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী' বেরুলো, সেদিন সাহিত্যজগতে যে বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে 'প্রবাসী'ও উক্ত কবিতাটিকে 'কষ্টিপাথরে' আসন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন অবিশ্যি আদিরসাত্মক, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অংশটুকু বাদ দিয়ে।

প্রগতি (শ্রাবণ ১৩৩৬)-তে বুদ্ধদেব লিখেছেন ঃ

> নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী' খুব উঁচু দরের কবিতা নয়, কিন্তু সেই কবিতার ভেতর দিয়ে আমরা একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যা বহুকাল শুনিনি, যা রবীন্দ্রনাথের স্বরের প্রতিধ্বনি নয়।

একটু পরে গিয়ে আবার বলছেন ঃ

> নজরুল ইসলাম বেশ কিছুদিন জোর গলায় জয়ধ্বনি করলেন, তার অধিকাংশ ফাঁকা আওয়াজ হলেও নূতনের কেতন বাস্তবিক উড়লো।

দ্র. আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত, শ্রেষ্ঠ নজরুল, (ঢাকা ঃ অবসর, ১৯৯৬) পৃ. ৬৩৩

৩৯. বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন ঃ

> কৃচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার অভিঘাতে ম্লানতম মফস্বলও থর থর করে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হয়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশশুদ্ধু লোক যেন সব-খোয়াবার মন্ত্রে খেপে গেল।
>
> ... . ..
>
> ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছল। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে — মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে — কী ভাগ্য! কী বিস্ময়! — একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালীর রাক্ষসী নদীর আগাছা কন্টকিত কর্দমাক্ত নদী তীরে বসে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত পড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিল 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে পড়ছেনা সেসব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগল, আর তাদের প্রবণতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ—নির্ঘোষ আমাদের মনের

> মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগল ঃ
>
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর
>
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর'
>
> ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখির ঝড়।
>
> নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোনো কবি হননি। দ্র. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল (কলকাতা। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪) পৃ. ১২৫-২৬।

৪০. বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি হলো ঃ

> পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি (নজরুল), কখনো বাড়েনি, বয়স্ক হন নি, পর পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হলো না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না

দ্র. কালের পুতুল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৪১. নজরুল-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) নতুন সম্পাদিত সংস্করণ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩৯৭

৪২. ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে 'culture' কথাটি ইংরেজ জাতির সঙ্গে নির্দিষ্ট করেই ব্যবহার করা হয়। ইংরেজ হলো self, আর ভারতীয়েরা মঁদণর। প্রকল্পটি অবশ্য এত সহজ ছিলনা। culture ধারনাটির মধ্যেই, এমনকি তার বুৎপত্তিতেই, একটা ঔপনিবেশিকতা আছে। রবার্ট যুং তার বইতে এ সম্পর্কে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দিয়েছে। দ্র. Robert J. C Young,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-২। রবার্ট লিখেছেন ঃ

> These meanings then separated out : with Christianity, the honour with worship' meaning of culture became the Latin cultus, from which we derive our word 'cult' — and from which the French derive their word couture. More significantly, the i'nhabit' meanins became the Latin colonus, former, from which we derive the word 'colony'— so, we could say, colonization rests at the heart of culture, or culture always involves a form of colonization, even in relation to its conventional meaning as the tilling of the soil

রবার্ট আরো অনেক অসাধারণ বিশ্লেষণ প্রদান করার পর আমাদের জানান, যে, 'সংস্কৃতি' একটা ঔপনিবেশিক শব্দই শুধু নয়, এর প্রয়োগ বহুকাল পর্যন্ত কেবল 'শাদা জাতি'র সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল। 'সংস্কৃতি' যে কেবল পশ্চিমে নয়, তার বাইরেও থাকতে পারে এবং আছে, এ কথাটি ইংরেজ পণ্ডিতেরা বহুদিন ভেবে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। 'সংস্কৃতি' বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একবচনেই (culture) ব্যবহৃত হয়েছে, বিংশ শতাব্দীতে নৃ-বিজ্ঞানী বোয়াস

'সংস্কৃতি'-র (culture) স্থলে 'সংস্কৃতিসমূহ' (cultures) ব্যবহার করেন। বোয়াস বহুবচনে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করেন অ-ইউরোপিয়দের সংস্কৃতি নির্দেশ করার জন্য। বহুদিন 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' শব্দদ্বয় পরস্পর-সংযুক্ত ছিল, অন্তত আঠারো শতক পর্যন্ত; অতঃপর নৃবিজ্ঞানীরা শব্দদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন করেন। তার কারণ, 'সভ্যতা'র সঙ্গে উপনিবেশস্থাপন ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ছিল গভীর। তবে ইউরোপের বাইরের সংস্কৃতি স্বীকার করা হলেও, ইউরোপের সংস্কৃতি যে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও আলাদা এই বোধ এখনো আছে। ফলে 'সংস্কৃতি' ও 'সংস্কৃতিসমূহে'র অর্থ দাঁড়ালো; ইউরোপের সংস্কৃতি, এবং ইউরোপের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন অন্য সংস্কৃতি। সংস্কৃতির এই পার্থক্যমূলক ধারণা ও বিন্যাসর মধ্যে Racism প্রকট। দ্র. Robert young, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১। অন্যদিকে 'সভ্যতা' যে কেবল ইউরোপের নিজস্ব ঘটনা, এবং বিশেষত ইংরেজ জাতির সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত, জেমস স্টুয়ার্ট মিল 'civilization' প্রবন্ধ লিখে সে কথা জানিয়ে দেন। নৃ তাত্ত্বিক প্রিচার্ড বলেন, বন্যতা-বর্বরতার স্তরের মানুষ কালো ছিল, 'সভ্যতার' আলো পেয়েই তাদের একটা অংশ শাদা হয়ে উঠেছে। সভ্যতার রং যে অতএব সাদা, এতে আর সন্দেহ থাকলোনা।

৪৩. বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন মনে করেন 'জাতীয়তাবাদ' মূলত মতাদর্শিক এক নির্মাণ, কিন্তু বেশ শক্তিশালী নির্মাণ; ইউরোপের 'print-capitalism'-এর সূত্রে পৃথিবী জুড়ে যার বিস্তার। দ্র. Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflection on the Orgin and spread of Nationatism (London : New Left, 1983) P. 41.

৪৪. নজরুল-রচনাবলী (১ম খণ্ড), নতুন সংরক্ষণ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ৯

৪৫. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ. ৮

৪৬. Barbara Harlow, Resistance Literature (London and New York : Metheun. 1987) P. 1-31এ গ্রন্থের ভূমিকাংশও দ্রষ্টব্য।

৪৭. মহাগ্রন্থ ও মহাআখ্যানের পতন কিভাবে এবং কেন ঘটেছে, তার জন্যে দ্রষ্টব্য ঃ Jean-Francois Lyotard, The postmodern Condition : A Report on Knowledge (Manchester : Manchester University Press, 1986).

৪৮. নজরুল-রচনাবলী, (১ম খণ্ড) নতুন সংস্করণ পৃ. ২৮৮

৪৯. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত ২৯৩

৫০. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৫১. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ. ১০

৫২. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩। দ্রষ্টব্য ঃ 'সাম্যবাদী'।

৫৩. মিখাইল বাখতিনের যুগান্তকারী ভাষা-দর্শন ও উপন্যাসতত্ত্বের কথা আজ আর অবিদিত নেই, যদিও দর্শনের পটভূমিকায় 'ভাষা'কে তিনি যেভাবে কখনো 'ডায়ালগ' হিশেবে, কখনো 'অস্তিত্ব' হিশেবে বিচার করেছেন এবং মানববিদ্যার যে ডায়ালজিক ভাণ্ডার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে গভীরতর পরিচয় লাভের চেষ্টা খুব কম লোকের মধ্যেই লক্ষ করা যায়।

মিখাইল বাখতিন ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘায়ু জীবন যাপন করেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই দীর্ঘ জীবনের এই অসামান্য মণীষী যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, নির্বাসন সবই দেখেছেন এবং এসবের মধ্যে দিয়ে আক্ষরিক অর্থে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সোক্রাতেস বলেছিলেন, 'নিজেকে জান'। বাখতিনের প্রশ্ন, নিজেকে জানব কি করে যদি অন্য আমাকে না জানে এবং আমি অন্যকে না জানি। পারস্পরিকতার মাধ্যমেই জ্ঞানের জন্ম এবং ভাষার অর্থ তৈরি হয়, যাকে বাখতিন 'ডায়ালজিজম' বলেন। জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে individual subjectivity-র যেসব প্রশ্ন উঠেছে, বাখতিন দর্শনের দিক থেকে অসাধারণ তদন্ত করেন। সময় ও পরিসরের ধারণা এবং দু'য়ের সম্পর্ক তাঁর সকল অনুসন্ধানের কেন্দ্রে। দ্র. Michael Holghist, Dialogism. : Bakhtin and His World (London and New York : Routledge , 1994) P. 13.

৫৪. মিখাইল বাখতিনের (১৮৯৫-১৯৭৫) রচনায় মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের 'কার্নিভাল উৎসব' বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়; বাখতিন একে 'popular counter-culture'-এর একটি বিশেষ ফর্ম হিশেবে দেখেন। তাঁর ধারণা, 'কার্নিভাল' হলো এমন এক উৎসব এবং ঘটনা, যা পরিহাস উচ্ছল ব্যঙ্গাত্মক-এবং এর মধ্যে এমন এক সাংস্কৃতিক আচরণ অভিব্যক্ত হয়, যা মধ্যযুগের সামন্তবাদী, দাপ্তরিক, বাঁধাধরা সংস্কৃতির বিপরীত (দ্র. M. Bakhtin, Rabelais and his World (London : MIT press, 1968) P. 4)। কার্নিভালের কোনো একক রূপ নেই, এ হলো এক 'বন্ধনহীন রসোচ্ছল পৃথিবী' (a boundless world of humorous forms)-তবে কার্নিভাল লোকসংস্কৃতির একটা প্রকরণ। কার্নিভাল নামক এই লোকসংস্কৃতি শিল্প ও জীবনের সীমান্তরেখায় অবস্থান করে ঃ জীবন এখানে এক রঙ্গের প্যাটার্নে উদ্ভাসিত হয় (দ্র. বাখতিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫)। কার্নির্ভালে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এবং কার্নির্ভালের সময় সামাজিক শ্রেণী, পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও পরিচয় লুপ্ত হয়ে জীবনের অন্যরূপ প্রকাশিত হয়। বাখতিন কার্নিভালকে 'প্রতীপ-সংস্কৃতি' বলে চিহ্নিত করেন। কার্নিভালের সংস্কৃতি জনবাদী ও গণতান্ত্রিক এবং প্রথাগত আপিশি থাকবন্দী সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কার্নিভাল হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, যার প্রকাশ বহুজবানি ও পলিফনিতে। অনেক কণ্ঠস্বর একত্রিত হয়ে কার্নিভালের পলিফনির জন্ম দেয়। কার্নিভালের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বাখতিনের মতে, এর অট্টহাস্য, রঙ্গতামাসা-যা official culture কখনো অনুমোদন করেনি। 'আপিশি সংস্কৃতি' কথাটির কি অর্থ, স্টালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নে তা কারো কাছে অজ্ঞাত ছিল না। মিখাইল বাখতিন 'কারনিভাল'কে কেন এতে গুরুত্ব দিচ্ছেন, রাশিয়ার কনটেক্স্ট মনে রাখলে তা ভাল বোঝা যাবে। সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও হায়ারারকিকে 'কার্নিভাল' বিব্রত করে দেয়। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসের বহুজবানিতে 'কার্নিভালের পরিস্থিতি' অবলোকন করেন বাখতিন (দ্র. Jeremy Hawthorn, A concise Glossary of contemporary Literary theory (London and New york : Edward Amold, 1992) P. 17.

৫৫. নজরুল ইসলাম লেখেন ঃ

> আমি আট বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন যৌবন ছিল, আর আমিও তার চঞ্চলতা নিয়ে যুবক। কিছুর ভয় করিনি।

দ্র. নজরুল-রচনাবলী, (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৫৬. ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও ক্ষমতার অনুকূলে, যার প্রকাশ শিক্ষা, সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণ, ভাষা ও ব্যাখ্যায়। তবে হোমি ভাভা মনে করেন, ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের মধ্যে hybridity থেকে যায়। ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে যারা লিখেছেন, অন্যের মত হওয়ার এবং অন্যের সঙ্গে মেশার বাসনাকে গোপন করতে পারেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি উপন্যাসগুলোতে এই hybridity খুব স্পষ্ট। এটি এসেছে, অধিকাংশ সময়ে, সেক্সচুয়্যাল সম্পর্কের সূত্রে এবং কলোনির কেন্দ্রের বাইরে বিবাহ ও অন্য যৌন যোগাযোগের পরিণামে। এর ফলে, উপনিবেশিক ডিসকোর্সে, একক নিয়ন্ত্রক কর্তৃত্ববাদী স্বর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে বারবার; ফলে 'আদারে'র পক্ষে কর্তৃত্বের ডিসকার্সিভ মুহূর্তগুলোতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়েছে। দ্র. Homi K. Bhaba, 'Signs taken for wonders, (critical Inquiry, 12 : 1, 1985) P. 154.

৫৭. নজরল ইসলামের গল্প-উপন্যাস এড়িয়ে তাঁর 'কবিতা'কেই শুধুমাত্র বিচারের আওতায় আনলাম কেন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ — ১৯৭৬) ৩টি গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' (১৯২২) 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) ও 'শিউলিমালা' (১৩৫১) ও ৩টি উপন্যাস 'বাঁধনহারা (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা'ঃ (১৯৩০) ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১) রচনা করেন। এর বাইরে নজরুলের চারটি প্রবন্ধের বইও আছে, যেমন 'যুগবাণী' (১৯২২), 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২২) ও 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২২)। নজরুল-রচনাবলীর নতুন সংস্করণে (১৯৯৩) নজরুলের আরো কিছু প্রবন্ধ যুক্ত হয়। নজরুলের 'ব্যথার দান' (১৯২২) বইটির জনপ্রিয়তা ছিল, তাছাড়া কল্লোলের লেখকদের মতো — যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে ভিন্ন — তিনি সমাজের অধস্তন, প্রান্তিক, নিচুতলার জীবনকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেন। যা হোক, নজরুলের কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা নেহাত কম হয়নি, আলাদাভাবে বইও লেখা হয়েছে (যেমন রাজিয়া সুলতানার 'কথাশিল্পী নজরুল' (ঢাকা ঃ মখদুমী এন্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী, ১৯৮৬) কিংবা শান্তিরঞ্জন ভৌমিকের 'নজরুলের উপন্যাস' (ঢাকা ঃ নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯২)—এ কারণে গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে বলিনি। 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটির কারণে, ইচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁর কথাসাহিত্য বিষয়ে কিছু বলা সম্ভবপর হয়নি। আমি বলতে চাই নজরুল ইসলাম যেসব লেখায় নন্দনতাত্ত্বিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে জীবন বা সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায় না, একধরনের নান্দনিক দূরত্ব — নিজের মতো করে — তিনি রচনা করে নেন। কথাসাহিত্য তিনি কেন লিখেছেন, তার কারণ নজরুলের নিজের স্বীকারোক্তি থেকেই বুঝে নেওয়া যায় ঃ

> কবিতা ও প্রবন্ধলেখকের আমাদের অভাব নেই। ..... আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথা-সাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। ....
>
> ত অভাবের কোন অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজে- তাতে করে হয়ত কোনোটাই ভাল করে হচ্ছে না।

'সওগাতে' (১৩৩৪) প্রকাশিত অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে লেখা একটা দীর্ঘ পত্রে নজরুল ইসলাম এই উক্তি করেন। দ্র. নজরুল-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১।

৫৮. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা (ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪) পৃ. ১৪৭-১৫৬।

৫৯. J. O. Urmson & Jonathan Ree (eds), The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers (London and New York; Routledge, 1995) P. 2-3

৬০. J. O. Urmson & Jonathan Ree, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৬১. J. O. Urmson & Jonathan Ree, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-১৬৩

৬২. Geoffrey H. Hartman, The Unremarkable Wordsworth (London : Methuen, 1987). P. 182.

৬৩. দর্শন ও দার্শনিকদের পূর্বোক্ত 'বিশ্বকোষে' লেখা হয়েছে ঃ

> The precise form of his dicussion depends on his (Kant) view that judgements differ in quantity, quality, relation and modality, so that the problem of aesthetics is mainly to say how aesthetic judgement differ in these four ways from others.

দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৬৪. অতুল চন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা, (কলকাতা, ১৯৬৩)।

৬৫. যেসব বইপত্র পড়ে আমার এই সাহিত্যতাত্ত্বিক বিশ্বাস তৈরি হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) গায়ত্রী চক্রবর্তী সিপভাক- অনূদিত জাক দেরিদার Of Grammatology (Baltimore and London : John Hopkins University Press, 1976); Writing and Difference (London : Routledge, 1978); Dissemination (London : Athlone Press, 1981); ও Positions (Chicago : Chicago University Press, 1981); (খ) রোঁলা বার্তের Critical Essays (Evanston : Northwestern University Press, 1972); Criticism and Truth (Minneepolis : University of Minnesota Press, 1987); The Empire of Signs (New York : Hill & Wang, 1986) ইত্যাদি।

৬৬. মার্টিন হাইডেগারের ভাষা-চিন্তা নিয়ে জাক দেরিদার চিত্তাকর্ষক আলোচনা আছে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ঃ Jacques Derrida, Margins of Philosophy (Chicago : University of Chicago Press, 1982) ও of Spirit : Heidegger and the Question (Chicago : University of Chicago Press, 1989), হাইডেগার ও দেরিদার ভাষা নিয়ে কিভাবে ভেবেছেন তার জন্যে দেখুন, Heidegger and Derrida : Reflection of Time and Langauge (London : University of Webraska Press, 1989) বইটি হারমান র‍্যাপাপোর্টের লেখা।

৬৭. John Lechte, Fifth Contemporary Thinkers (London and New York : Routledge, 1994) P. 106

৬৮. Barry Smart, Modern Conditions, Postmodern Controversies (London and New York : Routledge, 1992) P. 1-30, 141-170.

৬৯. এ সংক্রান্ত আলোচনায় সবচেয়ে জরুরী গ্রন্থটি হল একটি সংকলন, The Post-colonial Reader (London New York : Routledge, 1995)। উত্তর-ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স সংক্রান্ত আমার আলোচনা উক্ত বইয়ের আলোকে বিবৃত। এটি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদিত বিশাল আয়তনের বই।

৭০. সলাহউদ্দীন আইয়ুব, অরিয়েন্টালিজম, ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক (ঢাকা ঃ দেশ প্রকাশন, ১৯৯৬)।

৭১. G. W. Hegel, The Philosophy of History (New York : Dover Publications, 1956).

৭২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ১৯।

৭৩. নজরুল-রচনাবলী (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৭৪. নজরুল-রচনাবলী (১ম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৭৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম/কবি ও কবিতা (ঢাকা ঃ নজরুল একাডেমী, ১৯৭৭) পৃ. ২৫-৩২।

৭৬. Michael North, The Political Aesthetic of Yeats, Eliot and Pound (Cambridge : Cambridge University Press, 1991) P. 187.

৭৭. এ সম্পর্কে ছোট্ট কিন্তু সমৃদ্ধ সম্পাদিত গ্রন্থ বেরোয় ১৯৮৭ সালে, যা পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়। বইটির নাম Music and Society : The Politics of Composition, Performance and Receiption (Cambridge : Cambridge University Press, 1987).

৭৮. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯।

৭৯. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

৮০. নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৮১. গৌতম ভদ্র, ইমান ও নিশান ঃ বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায় (কলকাতা ঃ সুবর্ণরেখা, ১৯৯৪), পৃ. ৩০৩--৩০৪।

৮২. গৌতম ভদ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫।

৮৩. এডওয়ার্ড সাইদের বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে অনবদ্য। সাইদ বলেন, অন্য সংস্কৃতি এবং অপর দেশের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ইউরোপ যেসব আখ্যান লিখেছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য তাদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং সবদিক থেকে শাসন করা। 'সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদ' (মার্চ ১৯৯৩) বইতে সাইদ তাঁর সিদ্ধান্তকে 'দৃঢ় বিশ্বাস' বলে উল্লেখ করেন (পৃ. ১০০)। পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞতার সঙ্গে ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় এভাবে চরিতার্থ। অন্য দেশ, ভূগোল ও অপর-সভ্যতাকে পণ্ডিতেরা বর্ণনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেন ঃ Europeans should rule, non-Europeans be ruled. And Europeans did rule (পৃ. ১০০)। উনবিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ কেবল জ্ঞানের

বিকাশ ঘটায়নি, একই সঙ্গে একটা বিশেষ জাতির ক্ষমতাও প্রকাশ করেছে। উপনিবেশের দেশগুলো পর্যবেক্ষণ করে ইউরোপিয় পণ্ডিতদের সন্দেহ থাকেনা যে, তাঁদের জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অসভ্য জাতিদের শাসন করার জন্যেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শুধুমাত্র 'ইংরেজি সাহিত্য' শিক্ষা দেওয়া হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে এও বোঝানো হয়েছে যে ইংরেজ জাতি অতুলনীয়। এডওয়ার্ড সাইদ বলেন, শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বজনীনতা ও বিশ্বজননীনতার কথা ইংরেজ ও ইউরোপিয় ভাবুকেরা এত বেশি কেন বলেছেন, তা আজ ভেবে দেখার বিষয়। কার্লাইল ও রাস্কিনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সাইদ দেখান, 'বিশ্বজনীনতার কথা তাঁরা ইমান-আকিদা থেকেই বলেন। কার্লাইল-রাসকিনের সাম্রাজ্যবাদী ধারণা মজবুত ইমানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এ জগত ইংরেজের, ইংরেজই এব রাজা; ইংল্যাণ্ডই পৃথিবীকে শাসন করবে এবং ইংরেজের তা প্রাকৃতিক অধিকার; ইংরেজ ক্ষমতা ব্যবহার করবে, কেননা সে-ই তার যোগ্য; ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে বটে, কিন্তু তার কোনো মূল্য নেই; ইংরেজ একের পর এক দেশ দখল করবে এবং অতঃপর তার জ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প সারা ভুবনে ছড়িয়ে পড়বে। 'ইংল্যাণ্ড' সারা দুনিয়ার আলোর উৎস, রাসকিন ঘোষণা করেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪)। সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের সৃষ্টিশীল সাহিত্য উদ্যমেরও বিপুল বিকাশ ঘটে। কনরাড, কিপলিং, ও টি. ই. লরেন্স জানতেন ক্লাইভ, হেষ্টিংস, পালমারষ্টোন তাঁদের পূর্বপুরুষ ঃ সাম্রাজ্যবাদের অতিকায় স্বপ্নের ভেতরেই জন্ম হয়েছিল এসব আখ্যান ঃ The seven Pillars of Wisdom, Heart of Darkness, Lord Jim, Nostromo। এঁদের মনোলোক আচ্ছন্ন ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের পশ্চিমী প্রতিমায় (পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০)।

উপনিবেশের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে ধীরে ধীরে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। প্রাথমিক প্রতিরোধের পর উপনিবেশগুলোতে তৈরি হয় মতাদর্শিক প্রতিরোধ ঃ এই প্রতিরোধ ছিল ঔপনিবেশিক সিষ্টেমের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্প্রদায় পুনর্গঠনের আগ্রহজাত (দ্র. Basil Davidson, Africa in Modem History : The Search for a New Society (London : Allen Lane, 1978) P. 178-80)। ডেভিডসন দেখান, খ্রিস্টধর্ম ও ঔপনিবেশিক পোশাক বর্জনের মধ্যে দিয়ে এর প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে। জাতীয়তাবাদের শিক্ষা তৈরি হয় এভাবে; একটা বৃহত্তর ঐক্যের জন্যে মতাদর্শিক ভিত্তি নির্মাণ করা যার কাজ। আমরা বুঝতে পারি ফ্রানৎস ক্যানন কেন হেগেলের পুনঃপঠনের প্রস্তাব দেন এবং বলেন ঃ হেগেল যে মাষ্টারের কথা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদের মাষ্টার তার থেকে ভিন্ন। হেগেলের মাষ্টার পারস্পরিক বিনিময়ে বিশ্বাসী, সাম্রাজ্যবাদের মাষ্টার ওতে বিশ্বাস করেনা। সাম্রাজ্যবাদের প্রভু, 'দাসে'র চৈতন্য দেখে হাসে। ভৃত্যের কাছ থেকে সাম্রাজ্যবাদ চেতনা চায়না, চায় কাজ (দ্র. Frantz Fanon, Black Skin, White Mask, (New York : Grove Press, 1967 P. 220)। বোঝাই যাচ্ছে, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে অভিপ্রায় ও কার্যক্রম প্রথমদিকে শুরু হয়, তার মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি। জাতীয়তাবাদ সেসময় Print-captitalism-এর মাধ্যমে আমদানী হয়, যার মতাদর্শিক ভিত্তি সাম্রাজ্যবাদী আখ্যান ও ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স। এডওয়ার্ড সাইদ এই 'প্রতিরোধ'কে তাই, প্রতিরোধের আংশিক ট্রাজেডি হিশেবে চিহ্নিত করেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০)। সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি ও উপনিবেশ ডিসকোর্স এর জন্যে দায়ী। 'আফ্রিকা'র কথাই ধরি; পশ্চিমের আখ্যানে 'আফ্রিকা' একটা 'খালি পৃষ্ঠা' মাত্র। আফ্রিকার এই উপস্থাপন ও প্রতিমা দেশীয় লেখকদের প্রভাবিত করে। এমনকি আঁন্দ্রে জিদ ও আলবেয়ার কামুর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রচণ্ডভাবে সাম্রাজ্যবাদী, উত্তর-

ঔপনিবেশিক সমালোচকেরা যা ধরে ধরে দেখিয়েছেন। প্রতিরোধের আকুতি সত্ত্বেও অনেক লেখকের পক্ষে তাই ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ও সাম্রাজ্যবাদী আখ্যানের — যেমন জোশেফ কনরাডের Heart of Darkness — প্রভাব থেকে বেরোনো সম্ভবপর হয়নি (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-১২)।

এডওয়ার্ড সাইদ উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক উদ্যমকে প্রধানত কালপর্বের নিরিখে দেখেন, যা এজাজ আহমদ সমর্থন করতে পারেন নি। আমরাও করিনা। সাইদ মনে করেন, উপনিবেশ উঠে যাবার পর তৃতীয় বিশ্বে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিচারের যে প্রকাণ্ড উদ্দীপনা গড়ে ওঠে তা-ই মূলত উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য। কেননা তিনি দেখেন, ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স অমান্য করা সহজ ছিলনা। সাইদের বক্তব্য আংশিক সত্য; কিন্তু প্রশ্ন হলো, উপনিবেশের মধ্যেই যদি উপনিবেশ-বিরোধী প্রতিরোধাত্মক ডিসকোর্স গড়ে না উঠতো, তাহলে কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) 'বিষের বাঁশী' (১০২৪) 'ভাঙার গান' (১৯২৪) 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) 'সর্বহারা' (১৯২৬) কিভাবে লেখা হলো? কি করেই বা তিনি লেখেন 'যুগবাণী' (১৯২২) 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬) কিংবা 'রুদ্র-মঙ্গলে'র (১৯২৬) মতো প্রবন্ধের বই? কেন নজরুল ইসলামের বই একের পর এক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কেন ব্রিটিশ রাজ নজরুল ইসলামকে জেলে পাঠায়। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে নজরুল ইসলাম কি তাঁর ভাষা নিয়ে সাহিত্য নিয়ে অগ্নিবীণা নিয়ে দণ্ডায়মান হননি? শুধু ঔপনিবেশিক নয়, উত্তর-ঔপনিবেশিকতার সেই বুদ্ধিযুক্তি জিজ্ঞাসাও কাজী নজরুল ইসলাম চ্যালেঞ্জ করেন যা তার ঔপনিবেশিক অতীতকে এখনো ভুলতে পারেনি।